পার্থিব

অনন্ত বিজয় দাশ ও সৈকত চৌধুরী

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১১

পার্থিব। অনন্ত বিজয় দাশ ও সৈকত চৌধুরী

© লেখক

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম ই-বুক সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশক শুদ্ধস্বর
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল

ISBN 978-984-8972-41-0

Parthib by Ananta Bijoy Dash & Shoikot Chawdhury. A publication of Shuddhashar
First edition February 2011
First e-book edition February 2016

প্রণতি জানাই
বাংলার তিন নক্ষত্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকার প্রতি

আরজ আলী মাতুব্বর
আহমদ শরীফ
হুমায়ুন আজাদ

সূচি

ভূমিকা
মহাপ্লাবনের বাস্তবতা
'মিরাকল ১৯'-এর উনিশ-বিশ!
ভগবদ্‌গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য
ঈশ্বর ও ধর্ম প্রসঙ্গ : সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে

ভূমিকা

> To explain the unknown by the known is a logical procedure; to explain the known by the unknown is a form of theological lunacy.— **David Brooks**

পার্থিব জগতের জল, বায়ু, আহার্যের স্বাদ নিয়ে আমরা জীবজগতের সকলেই পার্থিব জগতে বেঁচে আছি। জগতের রূপ-রস-গন্ধ আমাদের মনকে ভরিয়ে তুলে, আনন্দ জোগায়। আমাদের ভালো-মন্দ-সুস্থতা-অসুস্থতা সবকিছুই এই পার্থিব জগতকে কেন্দ্র করে। ধরা যাক, দেখা সাক্ষাতের সময় আমরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন? প্রত্যুত্তর আসে ভালো আছি অথবা ভালো নেই। এই ভালো থাকা বা না-থাকা সবই ইহজাগতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে। আমরা সুখস্বপ্ন-কল্পনায় দেখি-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বিত্তশালী হওয়া, ব্যাপক পরিচিতি লাভ ইত্যাদি। এ সবই কিন্তু পার্থিব জগতে চাই। শোনা যায় কেউবা স্বপ্নে স্বর্গ-নরক দেখেছেন। স্বর্গের অতি মনোমুগ্ধকর পানাহার, অবাধ স্বাধীনতা অথবা নরকের আগুনে দগ্ধ পাপী-তাপীর তীব্র কষ্টের রেশ কিন্তু এই ইহজগতেই আমরা পেয়ে থাকি। কোথাও এমন কিছু কল্পনা করতে পারি না, যা ইহজগতে নেই। বোধকরি, কোনো না কোনোভাবে এই বস্তুজগতকে কেন্দ্র করে আমাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার পরিধি। এরপরও অনেকে বলেন অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা ঈশ্বর (গড, আল্লাহ, ইয়াহুয়া, ভগবান ইত্যাদি) কোনোভাবেই পার্থিব জগতের অধীন নয়। কিন্তু ঈশ্বরের যে সকল বৈশিষ্ট্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যেমন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বস্থানব্যাপী বিরাজমান ইত্যাদি। ওগুলো যেমন শক্তিমত্তা এই বস্তুজগতেরই অধীন। শক্তিমানদের প্রতি বেশিরভাগ মানুষ ভীতি-শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম বজায় রেখে চলে। মানুষ গর্বভরে পাঠ করে, 'বীরভোগ্য বসুন্ধরা'। জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা সকল মানুষেরই আছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতা থাকায় সে সর্বজ্ঞানী হতে পারে না। আর স্থান-কাল-পাত্র তো বস্তুজগতের অধীন। এভাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞায় 'ঈশ্বর'কে ভাঙলে বুঝা যায় অতিপ্রাকৃতের শিরোমণি ঈশ্বর সামান্য 'তৃণসম' মানুষের চিন্তার একটু বর্ধিতরূপ মাত্র। এজন্যই হয়তো পার্থিবজগতের জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী-দার্শনিকেরা বলেন—অতিপ্রাকৃত-অপার্থিব-অলৌকিক বলতে কিছুই নেই। যা আছে, তা এই পার্থিব মানুষেরই কাল্পনিক সৃষ্টি। আরো বলেন পার্থিব জগতে বিশ্বাসী কিংবা পার্থিব জগতে অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পার্থিব জগতের প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়, বিশ্ব-মহাবিশ্বের সবকিছুই পার্থিব প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত। তবু শোনা যায়, মানুষই না-কী অপার্থিবের কল্যাণে একমাত্র আশারাফুল মখলুকাত! কিন্তু দীর্ঘকালের কঠোর অধ্যাবসায়ে লব্ধ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক মনন ভিন্ন কথা বলে। বলে পৃথিবীর যাবতীয় অপার্থিবতা আমাদের মধ্যেই বিরাজমান। সবকিছু পার্থিব কারণেই সৃষ্ট। এও বলে পার্থিবতা সম্পর্কে সকলের ধারণা

স্পষ্ট না থাকা এবং পার্থিবতা সম্পর্কে এখনো সবকিছু না জানার কারণে ভয়ে, লোভে, লালসায়, ভণ্ডামি, সস্তা প্রচারের মোহে আবিষ্ট হয়ে পার্থিবতা ভুলে অপার্থিবতার জয়গান গেয়ে বেড়াই আমরা। অলৌকিকতার পায়ে মাথা নত করে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করি। গুটিকয়েক শোষক শ্রেণীর প্রতিভূকে ঈশ্বরের অবতার বানিয়ে আমাদের একমাত্র পার্থিব জগৎ তাদের জন্য উৎসর্গ করি। এতে মনুষ্য জীবনের ক্ষতি ভিন্ন লাভ মোটেই হয় না। যুগ যুগ ধরে রক্ত পানি করা শ্রমে উপার্জিত অর্থ অপার্থিবতার ধ্বজাধারীরা লুটে নেয়। আমাদের অপ্রাপ্তি, আর্তনাদ, ক্ষোভ, চোখের পানি, হাহাকার-সবই অপার্থিবতার দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে যায়। ধরণীতে জনগণতন্ত্র শেকলবদ্ধ হতে থাকে অপার্থিবতার কারাগারে। মানুষের বৌদ্ধিক মুক্তি, যৌক্তিক মনন দূর আকাশে পাড়ি জমায়।

আমাদের এই গ্রন্থে দীর্ঘকাল ধরে জনমানসে অবস্থিত কিছু অপার্থিব বিষয়সমূহকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আশা করি, সত্য উদ্ধরণের এই সৎ-প্রচেষ্টাকে পাঠক নঞর্থক অর্থে গ্রহণ করবেন না। বরং আপনার বিজ্ঞানমনস্কতা আর বিজ্ঞানসচেতনার পাঠে ক্ষীণমাত্র ভূমিকা রাখতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে ধরে নিব। এছাড়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধসমূহ সম্পর্কে যে কোনো ভিন্নমত, মতদ্বৈততা আমরা জানতে আগ্রহী।

এ গ্রন্থের সবগুলো প্রবন্ধই বাংলা ওয়েব ব্লগ মুক্তমনা'য় (www.mukto-mona.com) বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছিল। এর বাইরে আরো কয়েকটি বাংলা ওয়েব সাইট, ব্লগ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচুর সংখ্যক পাঠক তাদের মূল্যবান অভিমত জানিয়ে আমাদেরকে ঋদ্ধ করেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, মুক্তমনা ওয়েব সাইটের মডারেটর, বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক অভিজিৎ রায় এবং বন্যা আহমেদ, তাদের ঐকান্তিক তাগাদা, স্নেহবৎসল পরামর্শ আর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি মোটেই রচিত হত না। *বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল*-এর সকল সদস্য বিশেষ করে দীর্ঘদিনের সুহৃদ শ্রী লিটনচন্দ্র দাস, মনির হোসাইন, চিন্ময় ভট্টাচার্য, মাহমুদ আলী, হাসান শাহরিয়ার, সামসুল আমীন, অসীম দাস—যাদের সাথে এক সময়ের নিত্য তর্ক-বির্তক আর আড্ডার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এ গ্রন্থের ভিত। তাই আমাদের এই প্রাণপ্রিয় বন্ধুদের নামোল্লেখ ব্যতীত সন্তুষ্টি নেই। উল্লেখ করতে হয় আমাদের অগ্রজপ্রতিম মাহবুব সাঈদ মামুন এবং কলাণ কুমার বিশ্বাস-এর নাম। অন্তরালের এ প্রাজ্ঞ মানুষদ্বয়ের যুক্তি আর মুক্তচিন্তার প্রতি উৎসাহ, আগ্রহ, কর্মচঞ্চল মানসিকতা আমাদের ভিতর নানা সময়ে অনুঘটকের মত কাজ করেছে। পরিশেষে স্বীকার করি অত্যন্ত পরিচিত উদ্যমী প্রকাশক শুদ্ধস্বরের টুটুল ভাই (আহমেদুর রশীদ চৌধুরী) ব্যতীত এত অল্প সময়ের ভিতর এ গ্রন্থ আলোর মুখ দেখা সম্ভব ছিল না। কাজেই টুটুল ভাইয়ের পাওনা কৃতিত্বটুকু প্রদানে আমাদের বিন্দুমাত্র কৃচ্ছতাসাধনের ইচ্ছা নেই।

বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী সমাজ গঠনের শুভকামনায়—

অনন্ত বিজয় দাশ
ananta_bijoy@yahoo.com
এবং
সৈকত চৌধুরী
shoikot_chy@yahoo.com

২ জানুয়ারি, ২০১১

মহাপ্লাবনের বাস্তবতা

"পৃথিবীতে মনুষ্য জাতি সৃষ্টির পর মানুষ একসময় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব 'ঈশ্বর-বন্দনা' ছেড়ে দিয়ে ঘোর পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়েছিল। লোভ-হিংসা-বিদ্বেষ আর অপরাধ-প্রবণতার কারণে ভুলে গিয়েছিল সৃষ্টিকর্তাকে। মনুষ্য জাতির এই অধঃপতন দেখে বিচলিত বোধ করলেন ঈশ্বর। ক্রুদ্ধ হলেন তাঁর সৃষ্টির ওপর। মনে-মনে সংকল্প আটলেন—এই পাপ এবং পাপী থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ধ্বংস করে ফেলতে হবে সৃষ্টিজগৎ। নতুন করে ধরণীকে গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন প্লাবন। এক মহা-মহাপ্লাবন। যে প্লাবনের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল দুনিয়ার সমস্ত পাপী, ধ্বংস হয়েছিল সকল পাপের বিষ, এমন কী আমাদের চিরচেনা-মায়াবী এই জীবজগতও। তবে সৃষ্টিকর্তা শুধু বাঁচালেন হজরত নুহ্*, তাঁর পরিবার এবং সঙ্গী-সাথীদের। পরবর্তীতে তাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাণের বিস্তার ঘটালেন পৃথিবীতে। আমরা, পৃথিবীর মানুষেরা আজ সেই হজরত নুহের বংশধর।"—সারসংক্ষিপ্ত করলে প্রায় এই ধরনের কাহিনির বর্ণনা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে, বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকগাঁথা, বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে রয়েছে। লোকগাঁথা বা পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনাকে সাধারণ মানুষেরা অবাস্তব বা শুধু গল্প হিসেবে মেনে নিলেও, ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণনাকে 'সত্য' হিসেবেই বিশ্বাস করেন বেশিরভাগ মানুষ। আজন্ম লালিত তাদের পবিত্র 'বিশ্বাসের' কারণে এগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এটা সত্য যে, এই মহাপ্লাবনের কাহিনি দীর্ঘদিন আপামর জনসাধারণের মনে (বিশেষ করে ইউরোপিয়ানদের মনে) 'সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের লীলা বা প্রতিশোধ' হিসেবে বিরাজমান ছিল। যার ফলে নানা সময়ে এই লোকগাঁথাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার (যেমন জৈববিবর্তন তত্ত্ব) প্রমাণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবের বিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম ব্যাখ্যাদাতা চার্লস ডারউইন, ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল, চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিসহ আরো অনেকেই মহাপ্লাবনের বিপক্ষে নানা প্রমাণ হাজির করে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। তারপরও পশ্চিমাদের পবিত্র বিশ্বাসের মিশেল দেয়া 'অর্ধসত্য আর অর্ধমিথ্যার কৃষ্ণগহ্বর' থেকে বেরিয়ে এসে 'পূর্ণসত্যে'র সন্ধান লাভ সহজ হয়নি। দীর্ঘ সময় পাড়ি দিতে হয়েছে।

আমরা এ প্রবন্ধে পশ্চিমাদের জ্ঞান অন্বেষণের ইতিহাসে না ঢুকে, মহাপ্লাবনের সম্ভাবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব এবং মহাপ্লাবনের প্রেক্ষাপট বোঝানোর জন্য কিছু লোকগাঁথার কাহিনি উল্লেখপূর্বক প্রচলিত কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরব। তবে আগেই উল্লেখ করা ভালো, আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে 'মহাপ্লাবনের' সত্যতা নির্ণয়ে অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালানো

---

* হিব্রু উচ্চারণে নোয়া (Noa) এবং আরবি উচ্চারণে নুহ্ (Nuh)

সম্ভব নয়। আমাদের এই অক্ষমতা কিংবা রূঢ় বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মহাপ্লাবনের পৌরাণিক কাহিনিকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের জন্য অঙ্কের আশ্রয় নিতে হবে। কী উত্তর বের হয়ে আসে, তা একটু পরে দেখা যাবে।

হজরত নুহ্ (আঃ) ও মহাপ্লাবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত তথ্য

ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেলে'র ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) অন্তর্গত তৌরাত শরিফে হজরত নুহ্ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে : লামাকের একশো বিরাশি বছর বয়সে তাঁর একটি ছেলের জন্ম হল। তিনি বললেন, "আমাদের সব পরিশ্রমের মধ্যে, বিশেষ করে মাবুদ মাটিকে বদদোয়া দেবার পর তার উপর আমাদের যে পরিশ্রম করতে হয় তার মধ্যে এই ছেলেটিই আমাদের সান্ত্বনা দেবে।" এই বলে তিনি তাঁর ছেলের নাম দিলেন নুহ্। নুহের জন্মের পর লামাক আরো পাঁচশো পচানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরো ছেলেমেয়ে হয়েছিল। মোট সাতশো সাতাত্তোর বছর বেঁচে থাকার পর লামাক ইন্তেকাল করলেন। (পয়দায়েশ/জেনেসিস, ৫:২৮-৩১)

মাবুদ দেখলেন দুনিয়াতে মানুষের নাফরমানি খুবই বেড়ে গেছে, আর তার দিলের সব চিন্তা-ভাবনা সবসময়ই কেবল খারাপির দিকে ঝুঁকে আছে। এতে মাবুদ অন্তরে ব্যথা পেলেন। তিনি দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে দুঃখিত হয়ে বললেন, "আমার সৃষ্ট মানুষকে আমি দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব; আর তার সঙ্গে সমস্ত জীবজন্তু, বুক-হাঁটা প্রাণী ও আকাশের পাখিও মুছে ফেলব। এইসব সৃষ্টি করেছি বলে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নুহের উপরে মাবুদ সন্তুষ্ট রইলেন। (জেনেসিস, ৬:৫-৮)

এই হল নুহের জীবনের কথা। নুহ্ একজন সৎলোক ছিলেন। তাঁর সময়কার লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন খাঁটি। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ-সম্বন্ধ ছিল। সাম, হাম, ইয়াফস নামে নুহের তিনটি ছেলে ছিল। সেই সময় আল্লাহর কাছে সারা দুনিয়াটাই গুনাহর দুর্গন্ধে এবং জোর-জুলুমে ভরে উঠেছিল। আল্লাহ দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে, কারণ দুনিয়ার মানুষের স্বভাবে পচন ধরেছে। (জেনেসিস, ৬:৯-১২)

এই অবস্থা দেখে আল্লাহ নুহ্কে বললেন, "গোটা মানুষজাতটাকেই আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই দুনিয়া জোর-জুলুমে ভরে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার সবকিছু আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরি কর। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে; আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভিতরে আলকাতরা দিয়ে লেপে দিবে। জাহাজটা তুমি এভাবে তৈরি করবে : সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত, আর উচ্চতায় হবে ত্রিশ হাত। জাহাজটার ছাদ থেকে নিচে এক হাত পর্যন্ত চারদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের একপাশে। জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তলা থাকবে। আর দেখ, আমি দুনিয়াতে

এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করব, যাতে আসমানের নিচে যেসব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে, তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে। (জেনেসিস, ৬:১৩-১৭)

"কিন্তু আমি তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা স্থাপন করব। তুমি গিয়ে জাহাজে উঠবে আর তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার ছেলেরা, তোমার স্ত্রী ও তোমাদের ছেলেদের স্ত্রীরা। তোমার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের প্রাণী থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক-এক জোড়া জাহাজে তুলে নেবে। প্রত্যেক জাতের পাখি, জীবজন্তু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী এক-এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পার; আর তুমি সব রকমের খাবার জিনিস জোগাড় ও মজুদ করে রাখবে। সেগুলোই হবে তোমার এবং তোমাদের খাবার।" নুহ্ তা-ই করলেন। আল্লাহর হুকুম মত তিনি সবকিছুই করলেন। (জেনেসিস, ৬:১৮-২২)

এরপরে মাবুদ নুহ্কে আবার বললেন, "তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই জাহাজে উঠবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনকার লোকদের মধ্যে কেবল তুমিই সৎ আছ। তুমি পাকপশুর প্রত্যেক জাতের মধ্য থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত জোড়া করে তোমার সঙ্গে নেবে, আর নাপাক পশুর মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক জোড়া করে নেবে। দুনিয়ার উপর তাদের বংশ বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তুমি তা করবে। আমি আর সাতদিন পরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা করবো। তাতে চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকবে। আমি ভূমিতে যেসব প্রাণী সৃষ্টি করেছি তাদের প্রত্যেকটিকে দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব।" মাবুদের হুকুম মতই নুহ্ সব কাজ করলেন। (জেনেসিস, ৭:১-৫)

মহাপ্লাবন সম্পর্কে তৌরাত শরিফে বর্ণিত তথ্য

দুনিয়াতে বন্যা শুরু হওয়ার সময় নুহের বয়স ছিল ছ'শো বছর। বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য নুহ্, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা এবং ছেলেদের স্ত্রীরা সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। আল্লাহ নুহ্কে হুকুম দেবার সময় যা বলেছিলেন, সেইভাবে পাক ও নাপাক পশু, পাখি ও বুকে-হাঁটা প্রাণিরা স্ত্রী-পুরুষ মিলে জোড়ায় জোড়ায় সেই জাহাজে নুহের কাছে গিয়ে উঠল। সেই সাতদিন পার হয়ে গেলে পর দুনিয়াতে বন্যা হল। নুহের বয়স যখন ছ'শো বছর চলছিল, সেই বছরের দ্বিতীয় মাসের সতের দিনের দিন মাটির নিচের সমস্ত পানি হঠাৎ বের হয়ে আসতে লাগলো আর আকাশেও যেন ফাটল ধরলো। চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়তে থাকল। (জেনেসিস, ৭:৬-১২)

তারপর থেকে চল্লিশ দিন ধরে দুনিয়াতে বন্যার পানি বেড়েই চলল। পানি বেড়ে যাওয়াতে জাহাজটা মাটি ছেড়ে উপরে ভেসে উঠল। পরে দুনিয়ার উপরে পানি আরো বেড়ে গেল এবং

জাহাজটা পানির উপরে ভাসতে লাগল। দুনিয়ার উপরে পানি কেবল বেড়েই চলল; ফলে যেখানে যত বড় পাহাড় ছিল সব ডুবে গেল। সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবিয়ে পানি আরো পনের হাত উপরে উঠে গেল। এর ফলে মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রাণী, পাখি, গৃহপালিত আর বন্য পশু, ঝাঁক বেঁধে চরে বেড়ানো ছোট ছোট প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা গেল। শুকনা মাটির উপর যেসব প্রাণী বাস করত, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সবাই মরে গেল। আল্লাহ এইভাবে ভূমির সমস্ত প্রাণী দুনিয়ার থেকে মুছে ফেললেন। তাতে মানুষ, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং আকাশের পাখি দুনিয়ার উপর থেকে মুছে গেল। কেবল নুহ্ এবং তাঁর সঙ্গে যারা জাহাজে ছিলেন, তারা বেঁচে রইলেন। দুনিয়া একশো পঞ্চাশ দিন পানিতে ডুবে রইল। (জেনেসিস, ৭:১৭-২৪)

জাহাজে নুহ্ এবং তাঁর সঙ্গে যেসব গৃহপালিত ও বন্যপশু ছিল আল্লাহ তাদের কথা ভুলে যাননি। তিনি দুনিয়ার উপরে বাতাস বহালেন, তাতে পানি কমতে লাগল। এর আগেই মাটির নিচের সমস্ত পানি বের হওয়া এবং আকাশের সব ফাটল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়াও থেমে গিয়েছিল। তাতে মাটির উপরকার পানি সরে যেতে থাকল, আর বন্যা শুরু হওয়ার একশো পঞ্চাশ দিন পর দেখা গেল পানি অনেক কমে গেছে। সপ্তম মাসের সতের দিনের দিন জাহাজটা আরারাতের পাহাড়শ্রেণীর উপরে গিয়ে আটকে রইল। এরপরেও পানি কমে যেতে লাগল, আর দশম মাসের প্রথম দিনে পাহাড়শ্রেণীর চূড়া দেখা দিল। (জেনেসিস, ৮:১-৫)

নুহের বয়স তখন ছ'শো একবছর চলছিল। সেই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনেই মাটির উপর থেকে পানি সরে গিয়েছিল। তখন নুহ্ জাহাজের ছাদ খুলে ফেলে তাকিয়ে দেখলেন যে, মাটির উপরটা শুকাতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় মাসের সাতাশ দিনের মধ্যে মাটি একেবাতে শুকিয়ে গেল। তখন আল্লাহ নুহ্কে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে, তোমার ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে এস, আর সেই সঙ্গে সমস্ত পশু-পাখি এবং বুকে হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ যত জীবজন্তু আছে তাদের সকলকেই বের করে নিয়ে এসো। আমি চাই যেন দুনিয়াতে তাদের বংশ অনেক বেড়ে যায় এবং বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠে।" তখন নুহ্, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁদের সঙ্গে সব পশু-পাখি এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণী নিজের নিজের জাত অনুসারে বের হয়ে গেল। (জেনেসিস, ৮:১৩-১৯)

কোরান শরিফে হজরত নুহ্ (আঃ) এবং মহাপ্লাবন সম্পর্কে বর্ণিত তথ্য

কোরান শরিফে হজরত নুহের নামে আটাশটি আয়াতসমৃদ্ধ 'সুরা নুহ্' নামের একটি সুরা (৭১ নম্বর) আছে। এই সুরাসহ আরও কয়েকটি সুরার বিভিন্ন আয়াতে হজরত নুহ্ এবং

মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে, সময়ে সময়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এই কাহিনির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তবে তৌরাত শরিফের মত কোরানে এতো বিস্তৃত পরিসরে নুহের জাহাজের বর্ণনা কিংবা মহাপ্লাবনের ব্যাপারে (যেমন, জাহাজের উচ্চতা-আয়তন-ধারণ সংখ্যা, প্লাবন কতদিন ছিল ইত্যাদি) বক্তব্য দেয়া হয়নি। শুধু কোরান শরিফে নয়, তৌরাত শরিফ ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা পৌরাণিক উপাখ্যান কিংবা লোকগাঁথাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

হজরত নুহ্ ও মহাপ্লাবন সম্পর্কিত কিছু আয়াত বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'কোরান শরিফ সরল বঙ্গানুবাদ' থেকে তুলে ধরা হল (সাথে-সাথে কয়েকটি আয়াতের ইংরেজি রূপ-ও দেয়া হল) :

"আমি তে নুহ্কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে ওদের মধ্যে বাস করেছিল সাড়ে ন'শো বছর। তারপর প্লাবন ওদেরকে গ্রাস করে; কারণ ওরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।" (সুরা আনকাবুত, ২৯:১৪)। বাইবেলের জেনেসিসের ৮:২৮-২৯ নম্বর আয়াতেও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে হজরত নুহ্ সাড়ে নয়শত বছর বেঁচেছিলেন।

"নিশ্চয়ই আমি নুহ্কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র উপাসনা করো, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভুল করতে দেখছি।" (সুরা আ'রাফ, ৭:৫৯-৬০)

"সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো ভুল নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল।" (সুরা আ'রাফ, ৭:৬১)

"আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদেরকে সদুপদেশ দিচ্ছি, আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্র কাছ থেকে জানি।" (সুরা আ'রাফ, ৭:৬২)

"তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি, আর যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখান করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।" (সুরা আ'রাফ, ৭:৬৪)

"তারপর আমি তার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ তৈরি করো, তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও পৃথিবী প্লাবিত হবে তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া আর তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে। আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তাদেরকে ডোবানো হবে।" (সুরা মুমিনুন, ২৩:২৭)

"So We inspired him (saying): "Construct the ship under Our Eyes and under Our Revelation (guidance). Then, when Our Command comes, and the oven gushes forth water, take on board of each kind two (male and female), and your family, except those thereof against whom the Word has already gone forth. And address Me not in favour of those who have done wrong. Verily, they are to be drowned." (Surah Al-Mu'minun, 23:27)

"...তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ বানাও, আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না। তারা তো ডুববেই।" (সুরা হুদ, ১১:৩৭)

"সে জাহাজ বানাতে লাগল, আর যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার কাছ দিয়ে যেত তারা তাকে ঠাট্টা করত। সে বলত, 'তোমরা যদি আমাদেরকে ঠাট্টা কর আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা করব যেমন তোমরা ঠাট্টা করছ। আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর অপমানকর শাস্তি আসবে, আর স্থায়ী শাস্তি কার জন্য অবশ্যম্ভাবী।'" (সুরা হুদ, ১১:৩৮-৩৯)

"অবশেষে আমার আদেশ এলে পৃথিবী প্লাবিত হল। আমি বললাম, 'এর ওপর প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া উঠিয়ে নাও, যাতের বিরুদ্ধে আগেই স্থির করা হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবার-পরিজনকে ও যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকেও (উঠিয়ে নাও)।' তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল।" (সুরা হুদ, ১১:৪০)

(So it was) till then there came Our Command and the oven gushed forth (water like fountains from the earth). We said: "Embark therein, of each kind two (male and female), and your family, except him against whom the Word has already gone forth, and those who believe. And none believed with him, except a few." (Surah Hud, 11:44)

"...পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মাঝে এ তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল। নুহ্ তার পুত্র যে আলাদা ছিল তাকে ডেকে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে ওঠো আর অবিশ্বাসীদের সাথে থেকো না।" (সুরা হুদ, ১১:৪২)

"...এরপর বলা হল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শুষে নাও! আর হে আকাশ! থামো।' এরপর বন্যা প্রশমিত হল ও কাজ শেষ হল। নৌকা জুদি পাহাড়ের ওপর থামল; আর বলা হল 'ধ্বংসই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম।'" (সুরা হুদ, ১১:৪৪)

And it was said: "O earth! Swallow up your water, and O sky! Withhold (your rain)." And the water was diminished (made to subside) and the Decree (of Allâh) was fulfilled (i.e. the destruction of the people of Nûh (Noah). And it (the ship) rested on Mount Judi, and it was said: "Away

with the people who are Zalimûn (polytheists and wrong-doing)!" (Surah Hud, 11:44)

সুরা হুদের ৪৮ নং আয়াত পর্যন্ত হজরত নুহ্, মহাপ্লাবন সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আর অগ্রসর হলাম না।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্লাবন

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মৎসপুরাণ' এবং 'শতপথ ব্রাহ্মণ' (চারটি বেদের মধ্যে একটি হচ্ছে যজুর্বেদ, যা দুই ভাগে বিভক্ত—একটি হচ্ছে কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তরীয় সংহিতা অন্যটি শুক্লযজুর্বেদ; এই শুক্লযজুর্বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ)-এ ভগবান বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে একটি অবতার হচ্ছে 'মৎস' বা মাছ অবতার।

মৎসপুরাণ বা শতপথ ব্রাহ্মণেও অবশ্য মনুর নৌকা বা মহাপ্লাবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা নেই। উক্ত দুটি ধর্মগ্রন্থে মৎস অবতার আবির্ভাবের যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত আছে, তা সংক্ষিপ্তকারে হচ্ছে এ রকম :

> "প্রথম মানব 'মনু' একবার এক জলাশয়ে হাত-পা ধৌত করতে গিয়ে ছোট্ট একটি মাছ দেখতে পেলেন। ছোট ঐ মাছটি জলাশয়ের অন্যান্য রাক্ষুসে মাছ থেকে রক্ষা করার জন্য মনুর কাছে অনুরোধ জানালো। মনু তখন সেই মাছটিকে জলাশয় থেকে তুলে নিয়ে এসে 'নিরাপদ স্থান' হিসেবে জলভর্তি পাত্রে রেখে দিলেন। কয়েক দিনের মাথায় মাছটি আকারে বড় হয়ে গেল যে পাত্রে রাখা যাচ্ছে না; মনু তখন মাছটিকে একটি জলাশয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুদিনের মাথায় মাছটি আরো বৃহৎ হয়ে গেল, জলাশয়েও আর স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে মনু মাছটিকে নিয়ে গেলেন পুকুরে, সেখান থেকে নদীতে। এরপরও মাছটি দিনদিন দীর্ঘ হতে লাগল, শেষমেশ স্থান সংকুলানের জন্য বাধ্য হয়ে নিয়ে যেতে হল সমুদ্রে। একদিন মনু সমুদ্রে গেলে, মাছটি নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার পরিচয় দিয়ে পাপ আর পঙ্কিলতায় ডুবে যাওয়া সমগ্র পৃথিবীতে মহাপ্লাবনের ব্যাপারে আগাম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দ্রুত একটি বৃহৎ নৌকা বানাতে নির্দেশ দিল; কারণ আসন্ন মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। মনু ফিরে এসে মাছটির কথামতো কাজ শুরু করে দিলেন। পরবর্তীতে ভগবান বিষ্ণুর ঘোষিত মহাপ্লাবন শুরু হলে সারা পৃথিবী তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যেতে লাগল; মনু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাছের নির্দেশ মত নৌকায় গিয়ে উঠলো, আর মৎসরূপী বিষ্ণু তখন নৌকাটির গুণ টেনে নিয়ে বিরাট পাহাড়ের উপরে নিয়ে গেল। মহাপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে ভগবান বিষ্ণুর ইচ্ছা পূর্ণ হলে আস্তে আস্তে প্লাবনের পানি কমতে লাগল। বন্যার পানি কমে গেলে পৃথিবী পুনঃনির্মাণের জন্য মনু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পাহাড় থেকে ভূমিতে নেমে এল, এবং পুনরায় পৃথিবীতে বংশবিস্তারের মাধ্যমে মানব প্রজাতি টিকিয়ে রাখল।"

পৌরাণিক কাহিনি এবং লোকগাঁথা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে চরিত্রের নামের ভিন্নতা আর কাহিনির ছোটখাটো পরিবর্তন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্লাবন বা মহাপ্লাবনের কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। এরকম পাঁচটি লোকগাঁথার কাহিনি সংক্ষিপ্তাকারে নীচে দেয়া হল :

(১) রোমান পৌরাণিক কাহিনিতে রয়েছে, দেবতা-শিরোমণি জুপিটার এক সময় প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হলেন মানুষের নাফরমানি আর শয়তানি দেখে। সিদ্ধান্ত নিলেন ধ্বংস করে দিবেন তাঁরই সৃষ্ট এই জীবজগতকে। প্রথমে ঠিক করলেন আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হবে পৃথিবীকে, কিন্তু পরে আবার সিদ্ধান্ত বদল করে নিলেন; মহাপ্লাবনের পানিতে ভাসিয়ে-ডুবিয়ে হত্যা করা হবে সৃষ্টিকে। এজন্য দেবতা নেপচুনের সাহায্য নিলেন দুনিয়ায় ভয়ানক ভূমিকম্প-বজ্রপাতের মাধ্যমে মহাপ্লাবনের জোয়ার সৃষ্টি করতে; দেবতাশিরোমণির নির্দেশে দেবতা নেপচুনের কাছে শিরোধার্য। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুরু হল ভয়ানক মহাপ্লাবন, বিশাল-বিশাল স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল সকল প্রাণ, ডুবে যেতে লাগল পৃথিবী। কিন্তু শেষমেশ ডুবলো না শুধু পানাস্সুস পাহাড়ের চূড়া। ভয়ঙ্কর ঐ প্লাবনের সময় নৌকা বানিয়ে স্রোতে ভেসে ভেসে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল প্রমিথিউয়াস পুত্র ডিউকেলিয়ন এবং তার স্ত্রী পাইহা। আগে থেকেই তাদের সততা, নিষ্ঠায় মুগ্ধ ঈশ্বর জুপিটার। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হলে দুনিয়া থেকে বন্যার পানি কমিয়ে দিলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ডিউকেলিয়ন ও পাইহা একদিন পাহাড়ের চূড়া থেকে মাটিতে নেমে এলেন এবং দৈববাণী অনুসারে পৃথিবীতে পুনরায় বংশবিস্তার শুরু করলেন। (রোমান এই পৌরাণিক কাহিনির সাথে গ্রিসের পৌরাণিক কাহিনির লক্ষণীয় মিল রয়েছে, যেমন প্রমিথিউয়াস পুত্র ডিউকেলিয়ন এবং পাইহা নামের চরিত্র গ্রিক কাহিনিতেও রয়েছে, আর রোমান ঈশ্বর জুপিটারের বদলে ওখানে রয়েছে জিউস ইত্যাদি)।

(২) ২৮০০ খ্রিস্টপূর্বে রচিত সুমেরিয়ান পুরাণে রয়েছে, ঈশ্বর একসময় তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে (মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাওয়া ও আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত) মনুষ্য প্রজাতিকে ধ্বংস করে দিতে মনস্থির করলেন। কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজা জিউসুদ্রের প্রতি প্রীত হয়ে দেবতা এনলিল আগত বন্যার ব্যাপারে রাজাকে আগেই সতর্ক করে দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন একটি বড়সড় জাহাজ বানানোর জন্য। রাজা জিউসুদ্র দেবতা এনলিলের পরামর্শ মতো কাজ শুরু করে দিলেন। একসময় এলো সেই ভয়ানক কালরাত্রি; চারিদিক থেকে শাঁ শাঁ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসা বাতাস আর সাত দিন-সাত রাত ধরে অবিরাম বৃষ্টিতে এ ধরণী ডুবে গেল। বন্যার সময় জিউসুদ্র এবং তার পরিবারের সদস্যরা সদ্য তৈরি করা জাহাজ উঠে ভেসে বেড়াতে লাগলেন একস্থান থেকে অন্য স্থানে। জাহাজে বসে রাজা জিউসুদ্র সূর্যদেবতা উতুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন সূর্য উদয়ের জন্য, যাতে করে বৃষ্টি কমে গিয়ে বন্যার পানি নামতে শুরু করে। আস্তে আস্তে দেবতাদের ক্রোধ কমে এলে ধরণী

থেকে বন্যার পানিও কমতে লাগল, আকাশে সূর্যের দেখাও মিলল। বন্যার পানি একদম কমে গেলে রাজা সবাইকে নিয়ে ভূমিতে নেমে এলেন, এবং দেবতাদ্বয় অনু ও এনলিলের সন্তুষ্টি কামনায় একটি ভেড়া ও ষাঁড় কোরবানি দিলেন (মহাপ্লাবনের পরে কোরবানি দেয়ার ঘটনাটি তৌরাত শরিফেও উল্লেখ আছে, দেখুন : জেনেসিস, ৮:২০-২১)।

(৩) আসামের লুসাই আদিবাসীদের লোকগাঁথায় রয়েছে, একবার জলের রাজা, যিনি আবার শয়তানদেবতা, নগাই-তি নামক এক অপূর্ব সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়ে গেলেন। শয়তানদেবতা তাঁর চিত্তহরণকারী নারীর কাছে প্রেমে নিবেদন করতে গেলে, নগাই-তি তা প্রত্যাখান করে বসে এবং পালিয়ে যায়। সাধারণ এক নারীর দুঃসাহস দেখে দেবতা খুবই অপমানিতবোধ করলেন, ক্ষুব্ধ হলেন, রাগান্বিত হলেন! মানবীর সাথে প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে দেবতা নিজের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন; প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি মানবজাতিকে 'ফান-লু-বুক' পাহাড়ে ঘেরাও করে ফেললেন, হুমকি দিলেন—নগাই-তিকে না পেলে সকলকে তিনি পানিতে ডুবিয়ে মারবেন! শয়তানদেবতার হুমকিতে ভীত হয়ে জনগণ আশু বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নগাই-তিকে জোর করে বন্যার পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এরপরই দেবতার ক্রোধ কমে গেল এবং পাহাড়ের চারপাশ থেকে বন্যার পানি কমিয়ে দিলেন।

(৪) চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ললোবাসীদের লোকগাঁথা থেকে জানা যায়, স্বর্গের পিতা সিজুসিহ্ একজন মৃত মানুষের রক্ত ও কিছু মাংস নিয়ে আসার জন্য পৃথিবীতে একবার দূত প্রেরণ করলেন। দূতটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হল, কিন্তু একজন ব্যক্তি 'দুমু' শুধুমাত্র স্বর্গের পিতার কথা রক্ষা করলেন। পিতা পৃথিবীবাসীদের এই বেঈমানি দেখে খুবই দুঃখিত হলেন, সাথে-সাথে রাগান্বিতও হলেন। পৃথিবীবাসীকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারিদিকে মারাত্মক প্লাবনের সৃষ্টি হল। মানুষ, প্রাণী সকলেই বন্যার পানিতে ভেসে যেতে লাগল, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দুমু, তাঁর চার ছেলে, কয়েকটি বুনো হাঁস ও ভোঁদরসহ একটি বড়সড়-লম্বা গাছে আশ্রয় নিল এবং স্বর্গের পিতার করুণায় বেঁচে গেল। আজকে যারা সভ্য বা লেখাপড়া জানে, তারা দুমুর ঐ চার সন্তানের বংশধর; আর যারা অশিক্ষিত বা সভ্যতার আলো পায়নি, তারা কাঠ দ্বারা নির্মিত মূর্তির বংশধর, যেগুলিকে দুমু ও তাঁর সন্তানেরা ভয়াবহ মহাপ্লাবনের পর কুড়িয়ে পেয়ে মেরামত করেছিল।

(৫) পূর্ব আফ্রিকার মাসাইদের আঞ্চলিক লোকগাঁথা থেকে জানা যায়, অনেককাল আগে মাসাইদের ওখানে টামবাইনোত নামে একজন সৎ-আদর্শবান ও ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বাস করতেন। তার স্ত্রীর নাম নাইপান্দে এবং তাদের তিন সন্তানের নাম ওশমো, বার্তিমোরা ও বারমাও। একদিন টামবাইনোতের ভাই লেঙ্গারনি মারা গেলে স্থানীয় প্রথানুসারে তিনি মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করলেন। মৃত ভাইয়ের ঘরেও তিন সন্তান ছিল, ফলে ভাবীকে বিবাহের পর ঐ সন্তানগুলিও টামবাইনোতের সন্তান হয়ে যায়; অর্থাৎ নিজের তিন সন্তানসহ

মোট ছয় সন্তানের পিতা হন টামবাইনোত। পৃথিবীতে সেসময় প্রচুর জনসংখ্যা ছিল; জনসংখ্যার ভারে পৃথিবী কম্পমান। কিন্তু জনসংখ্যা অধিক থাকলেও মানুষের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা-নীতি-ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি বলতে কিচ্ছু ছিল না। হত্যা-ধ্বংস-দুর্নীতি-লুণ্ঠন-রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধ-প্রবণতায় পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর মানুষের ঐ অধোগতি দেখে ব্যথিত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন; মনঃস্থির করলেন ধ্বংস করে ফেলবেন এই মনুষ্যপ্রজাতিকে, সাথে বাকি জীবজগতকেও, সবকিছু নূতন করে গড়ে তুলবেন আবার। কিন্তু ঈশ্বর টামবাইনোতের সততায় সন্তুষ্ট ছিলেন, তাকে নির্দেশ দিলেন কাঠ দিয়ে একটি জাহাজ তৈরি করতে, যেখানে আশ্রয় নেবে টামবাইনোত, তার দুই স্ত্রী, ছয় সন্তান, ছয় সন্তানের স্ত্রী, এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রাণী। টামবাইনোতের জাহাজ বানানো শেষ হলে, ঈশ্বর ভয়ঙ্কর বৃষ্টির আদেশ দিলেন। একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারিদিকে ভয়ানক বন্যা হয়ে হয়ে গেল; বন্যায় ডুবে যেতে লাগল সব মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি আর টামবাইনোত তার পরিবার নিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। এক সময় বৃষ্টি থেমে গেলে, টামবাইনোত তার সঙ্গে থাকা একটি পায়রা উড়িয়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর পায়রাটি ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল; টামবাইনোত বুঝতে পারলেন : পায়রাটি চারিদিকে কোথাও বসবার জন্য শুকনো স্থান না পেয়ে জাহাজে আবার ফিরে এসেছে। দিন কয়েক কেটে গেলে টামবাইনোত একটি শকুন উড়িয়ে দিলেন, তবে কৌশলে শকুনের পালকের সাথে একটি তীর আটকে দিলেন; যাতে শকুনটি কোথাও বসলে, তীরটি যেন ঐ স্থানে আটকে যায়। ঐ দিন সন্ধ্যার দিকে শকুনটি ফিরে এলেও পালকের সাথে আর তীর আটকে ছিল না। টামবাইনোত বুঝতে পারলেন শকুনটি কোনো নরম স্থানে বসেছিল, যেখানে তীরটি আটকে গেছে। আরো কিছুদিন পর বন্যার পানি একদম কমে গিয়ে মাটির সমান হয়ে গেল। জাহাজটিও এক জায়গায় এসে আটকে গেল। তখন টামবাইনোত ও তার পরিবারের সদস্যরা ভূমিতে নেমে এসে আকাশে অপূর্ব সুন্দর রঙধনু দেখতে পেল। একে তারা ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করল।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত তৌরাত শরিফে (জেনেসিস অধ্যায়ে) হজরত আদম থেকে হজরত ইব্রাহিমের বয়সের তালিকা উল্লেখ আছে। কিন্তু হজরত ইব্রাহিম থেকে যিশু খ্রিস্টের জন্ম অবধি এই সময়কালের সেরূপ কোনো তথ্য (জন্মলতিকা) সরাসরি দেয়া নেই। তবে প্রাচীন নানা ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে ১৬৫৪ সালে আয়ারল্যান্ডের ধর্মযাজক জেমস আশার (১৫৮১-১৬৫৬) 'অ্যানালাস অফ ওল্ড এন্ড নিউটেস্টামেন্ট' গ্রন্থে বাইবেলে উল্লিখিত আদম এবং তাঁর বংশধরদের জন্মলতিকা যোগ করে জানিয়েছিলেন—ঈশ্বর এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে, রবিবার সকাল নয় ঘটিকায়, অক্টোবরের ২৩ তারিখে; এর কিছুকাল পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জন লাইটফুট (১৬০২-১৬৭৫) নতুন

গণনা করে জানালেন, আদমের জন্ম সকাল নয় ঘটিকায়, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে, এবং সেটা খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার চার সালেই। আবার বাইবেলে বর্ণিত 'মহাপ্লাবন' খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪৮ সালে হয়েছিল। এই দুই পণ্ডিতব্যক্তির সূক্ষ্ম দিনক্ষণের হিসাবকে বিশ্বের বেশিরভাগ ইহুদি এবং খ্রিস্টান সঠিক এবং এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে থাকেন।

বাংলা একাডেমীর ঐতিহাসিক অভিধান (মোহাম্মদ মতিউর রহমান সংকলিত, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩২৭) মতে, আদম পৃথিবীতে আসেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৮০৯ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৭৯ সালে। হজরত আদম থেকে হজরত নুহের বয়সের ব্যবধান ১০৫৬ বছর। হজরত নুহের বয়স যখন ছয়শত বছর, তখন মহাপ্লাবন ঘটেছিল; অর্থাৎ আদম জন্মের ১৬৫৬ বছর পর (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪৮ সালে) মহাপ্লাবন হয়েছিল। এরপর অতিক্রান্ত হয়েছে, ২৩৪৮ + ২০০৮ = ৪৩৫৬ বছর; আর একটি বারের জন্যেও মহাপ্লাবন হয় নি। (মানে দুর্নীতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধপ্রবণতা কমে গেছে, আর ঈশ্বরের প্রতি 'ঐকান্তিক বিশ্বাস' অটুট রয়েছে এখনও)।

ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কার বলা হয়েছে হজরত নুহ্ সাড়ে নয়শত বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে এতো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়—এটা কি ধর্মবিশ্বাসীদের সাধারণ বোধগম্যতায় প্রবেশ করে না?

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এবং পৌরাণিক লোকগাঁথায় মহাপ্লাবনের কাহিনি বর্ণিত আছে, তা থেকে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয় :

(১) মহাপ্লাবনের মাধ্যমে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়ার মত আদৌ এতো বৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব?

(২) হজরত নুহের জাহাজে কি পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে জায়গা হওয়া সম্ভব ছিল?

এ দুটি প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে পাঠকের দুটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার:

(ক) এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ তৌরাত শরিফকে বেছে নিয়েছি কারণ তৌরাত শরিফের জেনেসিস অধ্যায়ে হজরত নুহের জীবনী, নুহের জাহাজের বর্ণনা, মহাপ্লাবন ইত্যাদি বিষয় যেরকম বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা পৌরাণিক লোকগাঁথাতে এরকম বর্ণনা নেই। স্পষ্ট করে বললে, ওগুলোতে যা আছে, তা খুবই ভাসা-ভাসা বা হালকা চালে লেখা। ফলে বাইবেল ব্যতিরেকে বাকি সকল ধর্মগ্রন্থের বাণী বা লোকগাঁথা থেকে 'তথ্য' নিয়ে মহাপ্লাবনের কাহিনিকে 'সত্য' প্রমাণ করা সম্ভব না। (ওগুলোতে প্রচুর পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য রয়েছে, যেমন একটি ধর্মগ্রন্থে 'মহাপ্লাবন'কে অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থানীয় বন্যা বা প্লাবন হয়েছে বলে 'ইঙ্গিত' দিচ্ছে, আবার একই সাথে ঐ ধর্মগ্রন্থে হজরত নুহ্ সাড়ে নয়শত বছর বেঁচে ছিলেন,

সমস্ত পৃথিবী ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল, প্রতিটি প্রজাতি থেকে এক জোড়া করে প্রাণী সংগ্রহের কথা বলা হচ্ছে), কিংবা এ তথ্য সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোও সম্ভব না।

(খ) আমরা কোনোভাবেই স্থানীয় বন্যা বা প্লাবনকে অস্বীকার করছি না। বরং মনে করি, সেটি হবার সম্ভাবনাই বেশি। প্রাচীনকালের সকল সভ্যতাই নদীর তীর ঘেষে গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে ব্যবিলনীয় সভ্যতা এবং হাল আমলে আমলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা ঢাকা সভ্যতা। নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা তৈরি হলে, সহজেই ধারণা করা যায়, স্থানীয়ভাবে বন্যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়; এবং সে বন্যার সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রাচীনকালের মানুষকে বেশ আকর্ষণ করেছে। এ আকর্ষণের প্রভাব গিয়ে পড়েছে ঐ অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনায়; সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ধর্মগ্রন্থে, পৌরাণিক গল্পে, আঞ্চলিক লোকগাঁথায়।

এ বিষয়গুলো মাথা রেখেই আমরা আজকের এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র 'কথন' এবং 'অতিকথন' (স্থানীয় প্লাবনকে কল্পনার ফানুস দিয়ে ফুলিয়ে মহাপ্লাবন বানানো, সমগ্র পৃথিবীকে সেই মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে দেয়া, এক জোড়া করে পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি সংগ্রহ করে নৌকায় রাখা ইত্যাদি)-এর মধ্যবর্তী দূরত্বে আলো ফেলতে চাচ্ছি। আশা করি, পাঠক নিশ্চয়ই বিষয়টি বুঝতে পারছেন। তাই আর দেরি না করে, উপরের দুটি প্রশ্নের সমাধান অংকের মাধ্যমে দেওয়া যাক :

বিশ্ব জুড়ে মহাপ্লাবন হওয়া কী সম্ভব

পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে ৭,৯২৬ মাইল বা ১২,৭৫৬ কিলোমিটার। ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৬,৩৭০ কিলোমিটার। পৃথিবীর আয়তন হচ্ছে প্রায় ১,০৮০ বিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার বা প্রায় ১,০৮২,৬৯৬,৯৩২,০০০ কিউবিক কিলোমিটার। এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীকে ডুবিয়ে দেবার মত এত জল কোথা থেকে এল? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই। তারপর সেই জল গেল কোথায়? সারা পৃথিবীর মাটিতে শুষে নেয়া সম্ভব নয় (বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল), আবার অন্য কোনো উপায়ে উবে যাওয়াও সম্ভব নয়। একমাত্র যে জায়গায় এই জল যেতে পারে, সেটা বায়ুমণ্ডল; অর্থাৎ এই জল বাস্প হয়ে যেতে পারে। তাহলে বায়ুমণ্ডলেই এখনো জলটা আছে? ধরে নিচ্ছি, যদি আকাশের সমস্ত বাস্প জমে জলবিন্দুতে রূপান্তরিত হয় ও পৃথিবীতে ঝরে পড়ে, তাহলে কী আবার আর একটি মহাপ্লাবন হয়ে সর্বোচ্চ পর্বতগুলিকেও ডুবিয়ে দেবে? মনে হয় না, আর কোনো মহাপ্লাবন হবে, কারণ ঈশ্বর যে নিষেধ করেছেন, আর কখনো বন্যা হয়ে সমস্ত প্রাণীজগতকে ধ্বংস করবে না! (জেনেসিস, ৯.১৫)

আবহবিদ্যার বই থেকে আমরা জানতে পারি, প্রতি বর্গমিটারের উপরে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তাতে গড়পড়তা ১৮ কিলোগ্রাম জলীয়বাষ্প থাকতে পারে, এবং ২৫ কিলোগ্রামের বেশি থাকতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের এই আদ্রতা ঘনীভূত হয়ে এক সঙ্গে যদি ঝরে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে জলের গভীরতা কতটুকু বৃদ্ধি পায়?

এক বর্গমিটার জায়গায় সবচেয়ে বেশি জল থাকতে পারে ২৫ কিলোগ্রাম বা ২৫,০০০ গ্রাম; এবং ২৫,০০০ গ্রাম জলের আয়তন হবে ২৫,০০০ ঘনসেন্টিমিটারের সমান। এই আয়তন হবে প্রতি ১ বর্গমিটার বা ১০০ × ১০০ = ১০,০০০ বর্গসেন্টিমিটার জায়গার উপরের স্তরে। এখন জলের আয়তনকে ভূমির ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলেই জলস্তরের গভীরতা পরিমাপ করা যাবে, যেমন, ২৫,০০০ ÷ ১০,০০০ = ২.৫ সেন্টিমিটার; অর্থাৎ মহাপ্লাবনে সবচেয়ে বেশি জল জমা হলে, তা হতে পারে ২.৫ সেন্টিমিটার গভীর বা পৃথিবীর সবজায়গায় গড়ে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলেও মাত্র ২.৫ সেন্টিমিটার জমতে পারে। আবার এইটুকু উচ্চতায় জল জমা সম্ভব হতে পারে তখনই, যদি মাটি এই জল শুষে না নেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হজরত নুহের ঐ কথিত মহাপ্লাবনে সত্যিই ২.৫ সেন্টিমিটার থেকে বেশি জল জমা সম্ভব নয়।

কিন্তু বহু জায়গায় বৃষ্টিপাত অনেক সময় ২.৫ সেন্টিমিটারকে ছাড়িয়ে যায়। কারণ সেসব ক্ষেত্রে জল বায়ুমণ্ডল থেকে সোজাসুজি শুধু সে জায়গায় পড়ে না, পাশাপাশি অন্যান্য জায়গা থেকেও বাতাস জল বয়ে আনে। কিন্তু তৌরাত শরিফের মতে (পয়দায়েশ, ৭:২০), মহাপ্লাবন একই সঙ্গে সারা পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল জলের নিচে, সুতরাং তখন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বাতাসের মাধ্যমে জল আসা সম্ভব ছিল না।

সারা পৃথিবী জুড়ে প্লাবন যদি হয়েও থাকে, তাহলেও জল ২.৫ সেন্টিমিটারের বেশি উঠতে পারে নি। কিন্তু আমাদের হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮.৮ কিলোমিটার বা ৮৮০০ মিটার উঁচু। তৌরাত শরিফসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, আঞ্চলিক লোকগাঁথা এবং পৌরাণিক উপাখ্যানে বলা হয়েছে, মহাপ্লাবনের ফলে পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবে গিয়েছিল। এখন একটু কষ্ট করে, হিসেব করলেই বুঝা যাবে মহাপ্লাবনের এই জলের গভীরতাকে কতগুণ বাড়িয়ে বলা হয়েছে?

৮.৮ কিলোমিটার বা ৮৮০,০০০ সেন্টিমিটারকে (জলস্তরের গভীরতা) ২.৫ সেন্টিমিটার দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যায়, মাত্র ৩৫২,০০০ (তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার) গুণ বাড়িয়ে বলা হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে, কথিত ঐ 'প্লাবন' যদি বিশ্ব জুড়ে হয়ে থাকেও, তাহলে ঠিক যাকে বৃষ্টি বলে, তা হয়নি। একটা ঝিরঝিরে বর্ষণ হয়েছে মাত্র। কেননা, চল্লিশ দিন আর চল্লিশরাত বিরামহীন বৃষ্টির ফলে (জেনেসিস, ৭:১২) যদি মাত্র ২৫ মিলিমিটার (২.৫ সেন্টিমিটার) জল জমে, তাহলে দৈনিক বৃষ্টির পরিমাণ হবে ০.৬২৫ মিলিমিটার। আমাদের এখানে শরৎকালে যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয় তাতেও ১০ মিলিমিটারের মত জল থাকে (প্রায় ২০ গুণ বেশি)।

হজরত নুহ্‌ের জাহাজ

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ঐ জাহাজে পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে কি জায়গা সম্ভব ছিল? তৌরাত শরিফ (জেনেসিস, ৬:১৫) মতে, জাহাজ ছিল তিনতলা, লম্বায় ৩০০ হাত, চওড়া ৫০ হাত আর উচ্চতা ৩০ হাত।

প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার লোকদের এক হাত বলতে যে মাপ বোঝানো হত, তাকে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার বা ০.৪৫ মিটার। তাহলে, জাহাজটি লম্বায় ছিল ৩০০ × ০.৪৫ = ১৩৫ মিটার লম্বা; আর ৫০ × ০.৪৫ = ২২.৫ মিটার চওড়া। তাহলে, প্রতিটি মেঝের মাপ ছিল ১৩৫ × ২২.৫ = ৩০৩৭.৫ বর্গমিটার এবং তিনতলা মিলিয়ে জাহাজে মোট জায়গা ছিল ৩ × ৩০৩৭.৫ = ৯১১২.৫ বর্গমিটার।

পৃথিবীতে শুধু প্রাণী আছে দশ রকম Phylum-এর (উদ্ভিদের কথা না হয় বাদ দেয়া হল), যেমন—(১) Protozoa (২) Porifera (৩) Coelenterata (৪) Platyhelminthes (৫) Nemathelminthes (৬) Annelida (৭) Arthopoda (৮) Mollusca (৯) Echinodermata (১০) Chordata

দশ রকম ফাইলামের মধ্যে একটি হচ্ছে Chordata বা মেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন : (১) পাখি, (২) মাছ, (৩) সরীসৃপ (৪) উভচর (৫) স্তন্যপায়ী। এখন পর্যন্ত সবমিলিয়ে প্রায় ১.৭৫ মিলিয়ন প্রজাতির প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হয়েছে। মেরুদণ্ডী-অমেরুদণ্ডীসহ অণুজীব সকল প্রজাতি মিলিয়ে জীববিজ্ঞানীরা ধারণা করেন পৃথিবীতে প্রায় ২ মিলিয়ন থেকে সর্বোচ্চ ১০০ মিলিয়ন পর্যন্ত প্রজাতির অস্তিত্ব রয়েছে এবং এ প্রজাতিগুলোর মোট সদস্যসংখ্যা ৫০০ বিলিয়নের মত।

নিম্নে শ্রেণীবিন্যাসকৃত কিছু প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা উল্লেখ করা হল (তালিকাটি উইকিপিডিয়াসহ বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক ওয়েব সাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে):

উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী	৪৮০০
উষ্ণ রক্তের উড়তে সক্ষম পাখি	৯৮০০
উভচর	৪০০০
সরীসৃপ	৭১৫০
পতঙ্গ	১০ লক্ষের অধিক
অঙ্গুরিমাল (Annelid)	১৭০০০

এখন দেখি, নুহের জাহাজে কেবল উষ্ণরক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্যই জায়গা যথেষ্ট ছিল কি-না?

তৌরাত শরিফের বর্ণনা মতে (জেনেসিস, ৭:২৪), দুনিয়া ১৫০ দিন জলের নিচে ডুবে ছিল। তাহলে ঐ সময় উষ্ণরক্তের স্তন্যপায়ীদের জন্যই কেবল জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়নি, তাদের খাবারের জন্যও জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সাথে-সাথে হজরত নুহ্, নুহের স্ত্রী, তাঁদের তিন সন্তান, তিন সন্তানের স্ত্রীদের জন্য জায়গাসহ তাঁদের খাবার-দাবার রাখতে হয়েছিল। জাহাজে প্রতি জোড়া স্তন্যপায়ীদের জন্য জায়গা ছিল, ৯১১২.৫ ÷ ৪৮০০ = ১.৯ বর্গমিটার।

নিঃসন্দেহে এই জায়গা পর্যাপ্ত নয়। নুহের পরিবারের জন্য জায়গার দরকার হয়েছিল, তাঁদের নিজেদের খাদ্যের দরকার ছিল, প্রাণীদের খাঁচাগুলোকে ফাঁক-ফাঁক করে রাখতে হয়েছিল। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তিমি, ডলফিন, হাতি, রাইনো, হিপ্পো, বাঘ, সিংহ, গরু, ছাগল, হাতি, জিরাফসহ বিশাল আকারের জীব-জন্তুরা রয়েছে। এ সকল প্রাণীরও খাদ্যের দরকার ছিল। তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য ঘাস-গাছ-গাছালি, মাংসাশি প্রাণীদের জন্য মাংসসহ খাদ্যের স্টক কোথায় রাখা হবে? ছোট্ট একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোয়ালা নামক লেজবিহীন ছোট ভালুকের মত প্রাণীটির রোজ এক কেজি করে ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus) গাছের পাতা খায়, যা তার পুষ্টি ও পানির চাহিদা মিটিয়ে দেয়। ঐ জাহাজে শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই পর্যাপ্ত জায়গা হচ্ছে না, তাহলে অন্যান্য প্রাণীসহ ১৫০ দিন চলার মত তাদের খাদ্যের স্টক কোথায় রাখা হবে?

মোদ্দা কথা, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্লাবনের বর্ণনাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছে অঙ্কের হিসাব। আসলে ওরকম কিছু ঘটাই অসম্ভব। যদি কিছু হয়ে থাকে তো, মনে হয় কোনো স্থানীয় বন্যা হতে পারে। বাকি বক্তব্যগুলি সব কল্পনা। অতিমাত্রায় অতিকথন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১, কিতাবুল মোকাদ্দস, ঢাকা।

(২) রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, ২০০৭, কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। এবং Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, & Dr. Muhammad Muhsin Khan. Interpretation of the Meaning of The Noble Quran. Download Facility provided by : www.road-to-heaven.com

(৩) সেন, নারায়ণ, ২০০৪, ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চারশো কোটি বছর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০। এবং আন্তর্জালিক (Internet) ঠিকানা : http://gpc.edu/~pgore/geology/geo102/age.htm

(৪) খান, বেনজীন, ২০০৩, দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৮।

(৫) ঘোষ, প্রবীর, ২০০৩, আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০।

(৬) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.abarnett.demon.co.uk/atheism/noahs_ark.html

(৭) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.indianchild.com/animal_kingdom.htm

(৮) বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে মহাপ্লাবনের আরো কাহিনি জানতে আন্তর্জালে দেখুন : http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html

‘মিরাকল ১৯’-এর উনিশ-বিশ!

‘মিরাকল’ (miracle) বা অলৌকিকতা সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রত্যেকেই কম-বেশি অবগত আছেন। মিরাকল বলতে অনেকেই বুঝে থাকেন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে, যেমন স্রষ্টার অস্তিত্ব, স্রষ্টার কুদরতি শক্তি, স্রষ্টার যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা, স্বর্গ-নরকের ধারণা, আত্মার ধারণা, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবন, পুরষ্কার অথবা শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি। ধর্মের বাইরে খুব সামান্য পরিসরে আরও কিছু মিরাকল প্রচলিত আছে, যেমন ভিনগ্রহের প্রাণী, ইউএফও, টেলিপ্যাথি, রেইকি, অতিন্দ্রীয় দৃষ্টি ইত্যাদি। তবে এ ধরনের মিরাকল পশ্চিমা বিশ্বে যে মাত্রায় প্রচলিত আছে আমাদের দেশে এখনো সেই রেশ পৌঁছায়নি; কারণ হতে পারে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো আমাদের এখানে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেনি। ভিনগ্রহের প্রাণী বা ইউএফও সম্পর্কে তথ্য প্রচারের সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির সম্পর্ক আছে।

প্রতিটি ধর্মই মিরাকলে ভর্তি। কোনো ধর্মই তাদের নিজেদের লৌকিক দাবি করে না। আজকের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি মিরাকলের ওপর আলোকপাত করা। তবে আলোচনাটিকে সহজবোধ্য ও ব্যাখ্যেয় করার জন্য আমরা কোরান এবং ইসলাম ধর্মের বাইরের আরো কিছু বিষয়কে ছুঁয়ে যাব।

বাংলাদেশ একটি ধর্মপ্রবণ রাষ্ট্র এবং শিক্ষার মান যথেষ্ট নিম্নমুখী হওয়ায় এ দেশ মিরাকল বিকাশের উর্বর ভূমি। এ দেশে ধর্ম এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এত বেশি অন্ধ-আনুগত্য-বিশ্বাসের বিষয় যে, ধর্ম ছাড়া তাদের পক্ষে এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অথচ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে বা জড়িয়ে কোনো কিছু শোনানো হলে, তারা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। জ্যোতিষী, পীর-ব্যবসা এ কারণেই টিকে আছে। শহরাঞ্চলে কম থাকলেও গ্রামে-গঞ্জে ভূত-পেত্নী-পরী-বাণ মারা-জাদু করা-মারণ-উচাটন-পানি পড়া ইত্যাদিতে বিশ্বাস করার লোকের অভাব নেই। নব্বইয়ের দশকে ইরাকের কুয়েত দখলের পর যখন আমেরিকার সাথে ইরাকের যুদ্ধ চলছিল, ঐ সময় একদিন খবর ছড়ালো আকাশে সাদ্দামকে দেখা যাচ্ছে! কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আকাশে সাদ্দামকে দেখার জন্য; রাস্তাঘাটে জ্যাম লেগে গেল, বাড়ির ছাদে লোকে-লোকারণ্য। ইরাক-আমেরিকার ঐ যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান যাই হোক, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ প্রায় সবাই ইরাকের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। সাদ্দাম হোসেনের জনপ্রিয়তা তখন বাংলাদেশিদের কাছে তুঙ্গে। মানুষের ঐ দুর্বল অনুভূতিকে পুঁজি করে যে বা যারাই এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল সাথে সাথেই এই খবর গণহিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত করে। মানুষের প্রতিদিনকার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এক নিমিষেই রহিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে (ইরাকের পরাজয় যখন আসন্ন) এমন গুজবও ছড়িয়েছিল ফেরেশতারা সাদ্দাম বাহিনীকে

সহায়তা করা জন্য দলে দলে আকাশ থেকে ইরাকের দিকে ছুটে যাচ্ছেন!

প্রতিটি মিরাকলই গুজবের সমষ্টি। কাল্পনিক। অজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। মূল তথ্য বা ঘটনার বিকৃতি হয়ে থাকে নানাভাবে। মিরাকলের প্রতি সাধারণ মানুষের পক্ষপাত থাকলেও বাস্তবতার কোনো ভিত্তি নেই। যুগে যুগে কিছু মিরাকলের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন একটা সময় ছিল সূর্য ও চন্দ্রকে 'জীবন্ত অলৌকিক সত্তা' ভেবে পূজা করা হতো। কিন্তু চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণের পর অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী কতিপয় মানুষের এই 'অলৌকিক চন্দ্র-সূর্য' বিশ্বাসে হোঁচট লেগেছে; বাধ্য হয়েছেন গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত পূর্বের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎসই হচ্ছে মিরাকল মেনে নেওয়া। বাংলা ভাষার একটি সাধারণ বাগ্‌ধারা হচ্ছে 'তিলকে তাল করা'। কিন্তু মিরাকল বাস্তবতাকে শুধু 'তাল' করে না, কুমড়ো বানিয়ে ছাড়ে! বিখ্যাত স্কটিস দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) তাঁর 'An Inquiry Concerning Human Understanding' গ্রন্থে মিরাকল বা অলৌকিকতা বলতে বুঝিয়েছেন[১] : "A miracle is a transgression of a law of nature by a particular volition of the Deity, or by the interposition of some invisible agent" মানুষ কেন মিরাকল বিশ্বাস করে, তার কারণ বহুমাত্রিক। একটি কারণ হতে পারে, যতদিন মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং ধর্মগ্রন্থের বাণীকে অপৌরষেয় বলে বিশ্বাস করবেন, ততদিন 'মিরাকল' ভাবনা মুলার মত মানুষের মনে ঝুলে থাকবে।

বিজ্ঞান কি 'মিরাকল' বা অলৌকিক কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে? কিংবা বিজ্ঞান কি কোনো কিছুকে 'মিরাকল' বলে ঘোষণা করতে পারে? মোটেই না। সহজ কথায় যা লৌকিক নয়, তাই অলৌকিক। 'মিরাকল' বলতে স্পষ্টই বোঝায় প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী কোনো কিছু। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ লৌকিক, বস্তুবাদী। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে ঘটনা বা বিষয়গুলিকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্লেষণ করা। এখানে 'লৌকিক' বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা মেথডের সাথে জড়িত। বিজ্ঞান মানে কেবল কিছু ঘটনা বা বিষয়কে (পৃথিবীর সাথে চন্দ্রের দূরত্ব, সূর্যের দূরত্ব, পৃথিবীর বয়স, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্য, ইত্যাদি) জানা বা চিহ্নিত করা বোঝায় না; বিজ্ঞান স্পষ্টই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত; যথা বৈধ-প্রমাণের বৈশিষ্ট্য, অর্থবোধক গবেষণা নক্সা, সম্ভাবনার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয়, গবেষণার জন্য গৃহীত অনুকল্পগুলোর পরীক্ষণ, উপযোগী তত্ত্ব গঠন ইত্যাদি—যা এই পার্থিব জগতের কোনো নির্দিষ্ট ফেনোমেনা সম্পর্কে যথার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং অর্থবোধক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। বিজ্ঞানই আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে প্রাকৃতিক আইন বা নিয়মের রাশি। বিজ্ঞান ছাড়া এই প্রাকৃতিক আইন বোঝার চেষ্টা অবান্তর এবং ভ্রান্তও বটে। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যেমন : অবরোহ পদ্ধতি, আরোহ পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফলে অভিন্নতা, মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ ইত্যাদি। বিজ্ঞানের এই প্রতিটি পদ্ধতিরই কিছু মৌলিক নীতি রয়েছে। যেমন : সংজ্ঞা নির্ধারণ, কার্য-

কারণ সম্পর্ক, গবেষণার জন্য সংগৃহীত ডেটা বা উপাত্তের মধ্যে স্ববিরোধিতা-আত্মবিরোধিতা না থাকা, একই কারণ সব সময় একই ফল দেবে, কারণগুলো অবশ্যই বোঝা যাবে ইত্যাদি। উল্লেখ্য ধর্মগ্রন্থের বাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি মাত্র আয়াত বা শব্দগুচ্ছকে নিয়ে ডজন-ডজন ব্যাখ্যাকার ডজন-ডজন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন, নিজস্ব ভিন্নমত ব্যক্ত করেন, ফলে একই আয়াতে বা শব্দগুচ্ছকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে 'গড ইন দ্যা গ্যাপ্‌স' পূরণ করে কেউ কেউ উত্তর দেন, 'এর আসল অর্থ একমাত্র স্রষ্টাই জানেন, স্রষ্টাই সর্বজ্ঞ।'

কোনো একটি গবেষণার জন্য সংগৃহীত হাজার হাজার উপাত্তের মধ্যে যদি একটি উপাত্তের সাথে অন্যগুলোর আত্মবিরোধিতা থাকে, কোনো একটি উপাত্ত যদি বিশ্লেষণের সময় ভুল প্রমাণিত হয়, কিংবা উপাত্তগুলো এমন যে 'মিথ্যাপ্রতিপন্নকরণ' করার সুযোগ নেই তখন গোটা গবেষণাটাই খারিজ হয়ে যায়। 'রিসার্চ প্রবলেম' পরিবর্তন করতে হয়। আবার, গবেষণার জন্য যে প্রবলেম (গবেষণার বিষয়) বেছে নেওয়া হল, সেই প্রবলেমের টার্মগুলো যদি এমন হয় 'কার্যকরী সংজ্ঞা' (Operational definition) নির্ধারণ-ই করা যাচ্ছে না বা ভাসাভাসা-অস্পষ্ট থাকে তবে 'গবেষণা' প্রথম ধাপেই বাতিল হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'লৌকিক' বলতে বুঝায় যে বিষয় বা ঘটনা বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বা পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালাকে অতিক্রম করে না এবং বিজ্ঞান তার পদ্ধতির মাধ্যমেই ঐ বিষয় বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা-উদ্ঘাটন করে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেহেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল নন, তাই তাদের কাছে যে বিষয় বা ঘটনা সাধারণের অসাধ্য, পূর্বের চেনা জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাই 'অলৌকিক' বলে বিশ্বাস করেন। যেমন নবী মুহাম্মদের মিরাজে গমন।

ইদানীং কিছু কৌশলী ধর্মবাদী তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় নিচ্ছেন। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মগ্রন্থের বাণী মেলানোর জন্য যত চালাকির দরকার হয়, সেগুলোর কোনোটাই বাদ রাখছেন না। কারণ বিজ্ঞান ইতিমধ্যে সাধারণ শিক্ষিত লোকের মনে এই আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে, 'মানুষের কল্যাণেই বিজ্ঞান, অজানাকে জানার জন্য বিজ্ঞান ছাড়া কোনো উপায় নেই, বিজ্ঞান মানবীয় আবেগ নিরপেক্ষ, বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।' তাই ধর্মকে ভবিষ্যতের বাজারে টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞানের কোলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু ধর্মগ্রন্থের বাণী বা অলৌকিকতা আর বিজ্ঞানের কর্মপ্রক্রিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী। একটার সাথে আরেকটার সমন্বয়ের কোনো সুযোগই নেই; সংঘাতের ইতিহাস তো খুবই পুরানো। তারপরও শেষ চেষ্টা হিসেবে অন্তহীন জাড়িজুড়ি করে যাচ্ছেন কতিপয় অসাধু ধর্মবাদী। উদাহরণ, রাশেদ খলিফার আবিষ্কৃত কোরানের মিরাকল উনিশ।

এই প্রবন্ধে আল-কোরানের কথিত 'উনিশ' মিরাকল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা

হয়েছে, যথাস্থানে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা আছে। পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ, প্রবন্ধটির বক্তব্য, তথ্য, যুক্তি গ্রহণ বা বর্জনের আগে অবশ্যই নিজে যথাসম্ভব যাচাই করে নিবেন; খোলা মনে বিচার করবেন। শুধুমাত্র 'পূর্ববিশ্বাস বা আবেগের বশবর্তী হয়ে' বর্জন করা কিংবা 'বিরুদ্ধ মত' হিসেবে আমাদের বক্তব্যে আস্থা স্থাপন করা এই প্রবন্ধের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য নয়। জনমানসে যৌক্তিক চেতনা-বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশই উদ্দেশ্য।

(১) ইংরেজিতে 'Pareidolia' বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে, অর্থ হল : এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যা অস্পষ্ট (vague) ও এলোমেলো উদ্দীপনার (random stimulus) কারণে ভ্রান্ত অনুভূতি বা Illusion-এর সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহী উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি হয় বলে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যে কোনো একটির জন্য ইলিউশন হতে পারে। তবে এই ইলিউশনের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় দায়ী নয়, স্নায়ুসংকেত বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের অক্ষমতাই এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মানব মনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমরা যা দেখি বা উপলব্ধি করি, তা তৎক্ষণাৎ (অনেক সময় অজান্তেই) আমাদের চেনা জগতের সাথে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি-তুলনা করি। হঠাৎ করে নতুন কিছু দেখলে পূর্বের দেখা কোনো বিষয়ের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য খুঁজার চেষ্টা করি; যেমন দুটি বিন্দু পাশাপাশি বসিয়ে যদি এর নীচে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি একটি ছোট রেখা টানা হয়, অনেকের কাছেই একে 'মানুষের মুখমণ্ডলের অবয়ব' বলে মনে হবে। অথচ এই চিত্রে মানুষের মুখমণ্ডলের সাথে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ অনেক বেশি। প্রায়শই মানুষ চিন্তায় বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। তাই অস্পষ্ট এবং ভাসাভাসা কোনো কিছু দেখলে অনেক সময় পরিচিত কোন জিনিস বা বিষয়ের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় তুলোর মত টুকরো টুকরো ভেসে বেড়ানো মেঘমালায় বুঝি কারো মুখের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। কখনোবা চাঁদের গায়ে দেখা যায় কারও ছবি। আকাশে ইউএফও কিংবা মঙ্গল গ্রহে মানুষের মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে, এরকম প্রচুর বানোয়াট ছবি বাজারে রয়েছে। ২০০২ সালের ১৮ জুলাই ব্রাজিলের এক নাগরিক দাবি করলেন তার বাড়ির জানালার কাচে 'কুমারী মাতা' মেরির ছবি ফুটে ওঠেছে। বছর খানেক আগে কোন এক রাত্রিবেলা শুনা গেল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা দাবি করছেন চাঁদের গায়ে 'শিবের অবতার' লোকনাথের ছবি দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কী হৈচৈ!

২০০৬ সালের পহেলা জুন রব নাভাস নামের এক পাকিস্তানি মৎসজীবী এক ধরনের সামুদ্রিক মাছের (rabbit fish) পেটের মধ্যে আরবি অক্ষরে 'আল্লাহ' লেখা দেখতে পেলেন। দুবাইয়ের বিখ্যাত মাছের বাজার Shindagha-এ পরবর্তীতে ঐ মাছটি প্রদর্শনীর জন্য নিয়ে আসা হয়।[২] এর আগে ২০০৪ সালের ২৪ মার্চ ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে সহস্রাধিক মানুষ জড় হলেন একটি সদ্য-ভূমিষ্ট মেষ শাবক দেখার জন্য। শাবকটির মালিক ইয়াহিয়া আতরাস দাবি করছেন, 'সদ্য ভূমিষ্ট মেষ শাবকটির গায়ের একদিকে আরবি হরফে

'আল্লাহ' লেখা এবং অন্যপাশে 'মুহাম্মদ' লেখা।'[৩]

২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর এ্যালেন স্টোন নামের এক ব্যক্তি তার বাড়ির পিছনের আঙিনাতে একটি পাথর কুড়িয়ে পেলেন, পাথরের অস্পষ্ট খাজের মধ্যে আঁকাবাঁকা রেখা রয়েছে।[৪] ভদ্রলোক দাবি করতে লাগলেন, এটা যিশুর প্রতিকৃতি! একই বছরের ১৫ অক্টোবর তারিখে ভ্যাটিকেন টিভি চ্যানেল দুটি ছবি পাশপাশি দেখিয়ে গুজব ছড়ালো : 'কবরের পাশে আগুন জ্বলছে; সেই আগুনের লেলিহান শিখা বাতাসের কারণে এঁকেবেঁকে গেছে। আগুনের শিখাটি পোপ দ্বিতীয় জন পলের আবছায়া প্রতিকৃতি বলে মনে হচ্ছে।'[৫]

উপরের এই সবগুলো ঘটনাই Pareidolia উদাহরণ। মানুষের দুর্বল অনুভূতির স্থান বলে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গুজব ছড়ায় বেশি, আর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার অজুহাতে বেশিরভাগ সময় এই সব গুজবের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে দেওয়া হয় না। জন্মের পর থেকে শৈশব, শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পর্যন্ত তথাকথিত অতিপ্রাকৃত শক্তি বা আল্লাহ-ভগবান-ঈশ্বরের কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে যায়, চিন্তার কুঠরিতে ভক্তি-ভয়ের সৃষ্টি হয়। তার ওপর রয়েছে ধর্মীয় উপাসনার রীতিকে অবুঝ মনের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। ফলে শৈশবেই মানুষের মনে বা চিন্তায় ঈশ্বর-ভগবান-আল্লাহ সম্পর্কে এক ধরনের 'দৃষ্টিভঙ্গি' গড়ে ওঠে। অলৌকিক কোনো কিছুর অস্তিত্ব কস্মিনকালে না থাকলেও 'পরিস্থিতির শিকার' মানুষ বাধ্য হয় অলৌকিকতা দেখতে!

(২) Ernest Vincent Wright (১৮৭৩?-১৯৩৯) নামের একজন মার্কিন লেখক 'Gadsby: Champion of Youth' (Wetzel Publishing Co., 1939) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার একশত দশটি শব্দ দিয়ে গোটা উপন্যাস লেখা হলেও লেখক কোথাও একটি বারের জন্য ইংরেজি 'E' স্বরবর্ণটি ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ ইংরেজিতে 'E' অক্ষর ব্যবহার করে যত শব্দ (he, she, they, them, theirs, her, herself, myself, himself, yourself, love, hate, etc.) আছে সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি ২৫টি অক্ষর দিয়ে তৈরি শব্দ ব্যবহার করেছেন, বাক্য তৈরি করেছেন; অথচ এর ফলে ব্যাকরণগত ভুল, বাক্যের অসামঞ্জস্যতা, ভাব প্রকাশের দুর্বলতা বা ঘাটতি কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। নীচে 'Gadsby' উপন্যাসটির প্রথম প্যারাগ্রাফ তুলে দেওয়া হল[৬] :

> "If youth, throughout all history, had a champion to stand up for it; to show a doubting world that a child can think; and, possibly, do it practically; you wouldn't constantly run across folks today who claim that "a child don't know anything." A child's brain starts functioning at birth; and has, amongst its many infant convolutions, thousands of dormant atoms, into which God has put a mystic possibility for noticing an adult's act, and figuring

out its purport."

লেখকের এই কৃতিত্ব আর দক্ষতার জন্য তিনি কিন্তু এর জন্য কোনো 'মিরাকল শক্তি'-এর বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করেননি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, পরিশ্রম, সৃষ্টিশীলতার দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে অনেক 'অসম্ভবকে'ই 'সম্ভবের গণ্ডি'তে আবদ্ধ করা সম্ভব।

(৩) গণিত নিয়ে যাদের অল্প-বিস্তর লেখাপড়া আছে তারা অবশ্যই 'ফিবোনাক্কি রাশিমালা' সম্পর্কে অবগত আছেন। এই রাশিমালা আমাদের সামনে প্রকৃতি মাতার অপার রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। 'ফিবোনাক্কি রাশিমালা'র জন্মদাতা ইতালির নাগরিক Leonardo Pisano (১১৭৫-১২৫০) মৃত্যুর আগে একদা তাঁর তৈরি রাশিমালা নিয়ে জিজ্ঞাস্য হলে রহস্য করে বলেছিলেন, 'প্রকৃতির মূল রহস্য এই রাশিমালাতে আছে।'[৭] কি সেই রহস্য? সেটা জানার আগে এক ঝলক রাশিমালাটা দেখে নিই : আমাদের প্রচলিত ডেসিমেল পদ্ধতির রাশিমালা হচ্ছে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। এভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক রাশিমালা হচ্ছে ১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯ ইত্যাদি। আর ফিবোনাক্কি রাশিমালা হচ্ছে ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১৪৪, ২৩৩, ৩৭৭, ৬১০, ৯৮৭ ... ইত্যাদি। অর্থাৎ ফিবোনাক্কির রাশিমালাটা তৈরি হয়েছে প্রথম দুইটি রাশির যোগফল সমান পরবর্তী রাশি; ০ + ১ = ১, ১ + ১ = ২, ২ + ১ = ৩, ৩ + ২ = ৫, ৫ + ৩ = ৮, ৮ + ৫ = ১৩, ৮ + ১৩ = ২১ ইত্যাদি। এভাবে অদ্ভুত নিয়মে তৈরি এই রাশিমালার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা : এ রাশিমালার যে কোন চারটি সংখ্যা নেওয়া হলে প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যার যোগফলের সাথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল বিয়োগ করা হলে ফলাফল অবশ্যই সবসময় ঐ চারটি সংখ্যার প্রথমটি হবে। ধরা যাক চারটি ফিবোনাক্কি রাশি ২, ৩ , ৫, ৮। প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যার যোগফল (২ + ৮) ১০, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল (৩ + ৫) ৮ বিয়োগ করলে বিয়োগফল হচ্ছে ২, যা কিনা আমাদের ধরে নেওয়া চারটি সংখ্যার প্রথম সংখ্যা। আমরা সাধারণত ডেসিমেল পদ্ধতিতে হিসেব করে এতো অভ্যস্ত যে, কোন কিছুর গণনায় ডেসিমেল সংখ্যা (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) দ্বারাই কোন কিছুর হিসেব করে থাকি; যেমন ঘড়ি দ্বারা সময় নির্ণয়, টাকা-পয়সার লেনদেন, বাজার-সদাই ইত্যাদি। কিন্তু বিস্ময়করভাবে প্রকৃতির নানা স্তরে ফিবোনাক্কি রাশিমালার ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে, যেমন : সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ি বিন্যাসে, ক্যাকটাস গাছের পুরুত্বে, পাইন গাছের মোচায় ফিবোনাক্কি রাশিমালার সংখ্যা পাওয়া যায়। শামুকের খোলসে যে স্পাইরাল দেখা যায় সেখানেও ফিবোনাক্কির রাশিমালার উপস্থিতি রয়েছে। শীতের সময় আমাদের দেশে সুদূর সাইবেরিয়া হতে 'অতিথি পাখি' ঝাকে ঝাকে আসে। পাখিদের নিজেদের অঞ্চলে উষ্ণ আবহাওয়া দেখা দিলে স্থান পরিবর্তন করে তারা অন্য শৈত্য এলাকায় গমন করে। এই অতিথি পাখির ঝাক গণনা করে দেখা গেছে তাদের একেকটি ঝাকে ২১টি

পাখি থাকে, ২২ বা ২৩টি পাখি থাকে না। মজার ব্যাপার ফিবোনাক্কি সিরিজে ২১ সংখ্যাটি রয়েছে, ২২ বা ২৩ সংখ্যা নেই। মৌমাছিদের জীবনযাত্রায়ও রয়েছে ফিবোনাক্কি রাশিমালার উপস্থিতি। মৌমাছিরা সাধারণত কলোনি করে থাকে। প্রতিটি কলোনিতে একটি পুরুষ মৌমাছির পিতা-মাতা ১ জন, দাদা-দাদী ২ জন, প্রপিতা-মাতা ৩ জন, প্রপিতা-মাতার পিতা-মাতা ৫ জন এবং এদের পিতা-মাতা ৮ জন। এভাবে ক্রমেই মৌমাছির বংশতালিকায় ফিবোনাক্কি রাশিমালার সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যায়।

সুখের সংবাদ প্রকৃতির এতো বৈচিত্র্যময় স্থানে ফিবোনাক্কি রাশিমালার উপস্থিতি দেখা গেলেও এখন পর্যন্ত এই রাশিমালাকে এর জন্মদাতা ফিবোনাক্কি বা অন্য কেউ 'অলৌকিক রাশিমালা' বলে দাবি করেননি।

(৪) ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলার পর সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে '১১' সংখ্যাটি নিয়ে একটি অতিলৌকিক-আধোভৌতিক পটভূমি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। পটভূমির উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন ইজরাইলের সাবেক গুপ্তচর, সাবেক জাদুকর এবং বর্তমানে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সম্রাট হিসেবে (কু)খ্যাত ইউরি গ্যালার[৮]; তিনি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরপরই সবাইকে (বিশেষ করে আমেরিকানদের) উপদেশ দান করেন প্রত্যেকেই যেন প্রতিদিন ১১ সেকেন্ড করে প্রয়োজন মত প্রার্থনা করেন।[৯] কারণ তাঁর মতে : '১১ হচ্ছে একটি রহস্যময় সংখ্যা, এর মধ্যে অপ্রাকৃত গোপন নানা তথ্য লুকানো রয়েছে এবং এ সংখ্যা দুনিয়ার পার্থিবতা এবং অপার্থিবতার সংযোগ সেতু।' ইউরি গ্যালার শুধু বক্তব্য দান করেই ক্ষান্ত হননি, ৯/১১-এ ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার সাথে '১১' সংখ্যাটির একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। নীচে তাঁর আবিষ্কৃত সম্পর্কটির উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হল[১০] :

- ❖ সন্ত্রাসী হামলার তারিখ ৯/১১ : ৯+১+১=১১।
- ❖ ১১ই সেপ্টেম্বর বছরের ২৫৪তম দিন : ২+৫+৪=১১।
- ❖ ১১ই সেপ্টেম্বর পর বছর শেষ হতে ১১১ দিন বাকি থাকে।
- ❖ ১১৯ হচ্ছে ইরাক/ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ১+১+৯=১১। রাষ্ট্রীয় কোডটি উল্টো করে গণনা করলে হামলার তারিখটি আবার সামনে চলে আসে। [উপরোক্ত তথ্য মিথ্যা। ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৮ অর্থাৎ ৯+৮=১৭ এবং ইরাকের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৬৪ অর্থাৎ ৯+৬+৪=১৯, সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৬৬ অর্থাৎ ৯+৬+৬=২১]
- ❖ আক্রমণস্থল টুইন টাওয়ার দেখতে ইংরেজি ১১-এর মত।
- ❖ প্রথম আক্রমণকারী বিমান : 'ফ্লাইট-১১।' আমেরিকার এয়ারলাইন্সকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে 'AA' বলা হয়। এই 'AA' ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, পাশাপাশি সাজালে ১১।
- ❖ ইংরেজি 'Afghanistan' শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।
- ❖ ইংরেজি 'New York City' শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে। আমেরিকাতে 'New York'

১১তম রাজ্য। [নিউইয়র্কের সাথে 'City' শব্দ জুড়ে দিয়ে ১১টি অক্ষর গণনা করা হয়েছে, কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে 'Country' শব্দ ধরা হয়নি।]

- ❖ইংরেজি 'The Pentagon' শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।
- ❖এছাড়া ইংরেজি 'George W. Bush', 'Bill Clinton', 'Saudi Arabia', 'Colin Powell' শব্দগুলিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।

(৫) সংখ্যা দিয়ে বিন্যাস-সমাবেশ করে ধর্মগ্রন্থকে অলৌকিক দাবি করার অভ্যাস বেশ পুরানো। রুশ বংশোদ্ভূত গণিতবিদ এবং খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক ড. ইভান পেনিন (১৮৫৫-১৯৪২) একদা দাবি তুলেছিলেন বাইবেল 'ধর্মগ্রন্থটি ৭ সংখ্যা দ্বারা চমৎকারভাবে আবদ্ধ।'[১১] বাইবেলের (ওল্ড টেস্টামেন্ট) প্রথম আয়াত : 'In the beginning God created the heavens and the earth.' (সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করলেন)। (জেনেসিস, ১:১)। উক্ত আয়াতে হিব্রু ভাষায় ৭টি শব্দ আছে এবং ২৮টি অক্ষর আছে (৭×৪)। তিনটি বিশেষ্য (noun) রয়েছে যথা ঈশ্বর (God), আসমান (heavens), জমিন (earth)। হিব্রু ভাষায় যেহেতু কোনো সংখ্যা নেই, বর্ণগুলোর যোগফলই হচ্ছে সংখ্যা মান (numeric value)। তাই এই আয়াতের তিনটি বিশেষ্যের সংখ্যামান হচ্ছে ৭৭৭ (৭×১১১)। আয়াতটির ক্রিয়াপদ 'created'-এর সংখ্যা মান হচ্ছে ২০৩ (৭×২৯)। আয়াতটির Object হচ্ছে প্রথম তিনটি শব্দ 'In the beginning'; ১৪টি বর্ণ দিয়ে গঠিত (৭×২) এবং বাকি চারটি শব্দও (Subject) ১৪টি বর্ণে গঠিত। হিব্রু ভাষায় আয়াতটির চতুর্থ ও পঞ্চম শব্দদুটিও ৭টি বর্ণে গঠিত। ক্রিয়াপদ 'created'-এর প্রথম, মধ্যম এবং শেষ বর্ণের সংখ্যা মান ১৩৩ (৭×১৯)। আয়াতের সব কটি শব্দের প্রথম এবং শেষ বর্ণের সংখ্যা মান ১৩৯৩ (৭×১৯৯)। বাইবেলের মধ্যে লেখক হিসেবে ২১ জন ব্যক্তির নাম রয়েছে (৭×৩)। হিব্রু ভাষায় তাঁদের নামের সংখ্যা মান ৭ দ্বারা বিভাজ্য। এই ২১ জনের মধ্যে ৭ জনের নাম রয়েছে নিউ টেস্টামেন্টে, যথা : Moses, David, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Hosea and Joel। এই ৭টি নামের সংখ্যা মান হল ১৫৫৪ (২২২×৭)। ডেভিড নামটি পাওয়া যায় ১১৩৪ বার (১৬২×৭)। বাইবেলে 'seven-fold' শব্দগুচ্ছটি (phrase) ৭ বার রয়েছে, '৭০' এসেছে ৫৬ বার (৭×৮), ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য ৭ দিন সময় নিয়েছেন, ইজরায়েলিরা ৭ দিনে ৭ বার মার্চ করেছে জেরিকোর দিকে। শেষ গ্রন্থ 'প্রকাশিত কালাম' (Revelation)-এ রয়েছে ৭ জন পবিত্র আত্মা ৭টি তূর্য (trumpet) নিয়ে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাছাড়া রয়েছে ৭টি স্বর্ণের বাতির স্ট্যান্ড, ৭টি চার্চ, ৭টি তারা, ৭জন রাজা, ৭টি পাহাড়।[১২] আবার Psalm 118 অধ্যায় সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে, এটি বাইবেলের মাঝের অধ্যায়। Psalm 117 অধ্যায়টি সর্বকণিষ্ঠ এবং Psalm 119 অধ্যায়টি সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায়। Psalm 118 অধ্যায়ের আগে ৫৯৪টি অধ্যায় রয়েছে এবং Psalm 118 অধ্যায় পরে আরো ৫৯৪টি অধ্যায় রয়েছে।[১৩]

স্বীকার করছি, আমরা এই প্রবন্ধের লেখক দুজনের কেউই হিব্রু ভাষা জানি না। তাই উপরোক্ত হিব্রু ভাষার দাবিগুলো যথার্থভাবে অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। খ্রিস্টানদের দাবিকৃত 'মিরাকল ৭' ভাষ্য তুলে দেওয়ার কারণ হল পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটানো, তাদের চিন্তার খোরাক যোগানো।

এক নজরে রাশেদ খলিফা[১৪]

জন্ম : নভেম্বর ১৯, ১৯৩৫ (মিশর)
মৃত্যু : জানুয়ারি ৩১, ১৯৯০ (বয়স ৫৪)
জাতীয়তা : মিশরীয়-আমেরিকান
পেশা : জৈব-রসায়নবিদ
ধর্মীয় বিশ্বাস : ইসলাম, United Submitters International (USI)

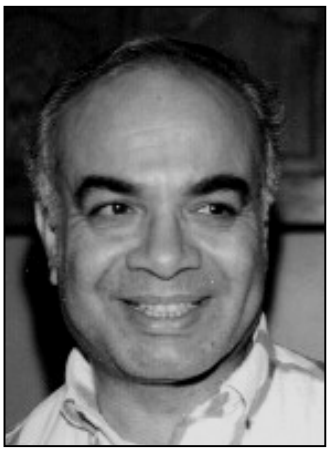
রাশেদ খলিফা

***জীবন-বৃত্তান্ত** : রাশেদ খলিফা (Rashad Khalifa) কায়রোর এইন শামস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৯৫৯ সালে আমেরিকাতে আসেন এবং ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন জৈব-রসায়নবিদ্যায়। ১৯৭৫-৭৬ সালে তিনি প্রায় বছর খানেক লিবিয়া সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে রসায়নবিদ হিসেবে জাতিসংঘের অধীনে ভিয়েনাতে শিল্পউন্নয়ন সংস্থায় যোগ দেন এবং সেখান থেকে ১৯৮০ সালের দিকে সিনিয়র রসায়নবিদ হিসেবে আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যের সরকারি রসায়ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বিশটির মত বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, নিজে কোরান অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে এবং ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থের নাম : 'The Computer Speaks: God's Message to the World'। রাশেদ খলিফার লেখা গ্রন্থ, আর্টিকেল বা গবেষণা সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায় এই ঠিকানায় : International Community of Submitters (ICS), P.O. Box 43476, Tucson, AZ 85733 এবং ওয়েব সাইট http://www.submission.org।*

রাশেদ খলিফা ইসলাম ধর্মে 'United Submitters International' নামে নতুন একটি ধর্মীয় গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর অনুসারীরা নিজেদের 'মুসলমান' হিসেবে পরিচয় দেবার পরিবর্তে 'Submitter' এবং ইসলাম শব্দের পরিবর্তে 'Submission' শব্দ ব্যবহার করেন।

রাশেদ খলিফা ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় বিশ্বাস : (১) আল-কোরান'ই একমাত্র গ্রহণীয় ধর্মগ্রন্থ। তবে এটিও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। (২) নবী মুহাম্মদের সুন্নাহ পুরোপুরি বাতিল; ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রথা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) রাশেদ খলিফা নবী মুহাম্মদের পরে ইসলাম ধর্মের একজন রসুল। (৪) তাঁরা নবী ইব্রাহিমের রীতি অনুসরণ করে প্রার্থনা করে থাকেন[১৫]; যদিও তেমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য উৎস নেই যে নবী ইব্রাহিম কিভাবে প্রার্থনা করতেন।

রাশেদ নিজের ইংরেজি অনুবাদকৃত কোরানের 'সুরা ফুরকান', 'সুরা ইয়াসিন', 'সুরা শুরা' এবং 'সুরা তাক্‌ভির'-এর আয়াতে নিজের নাম ঢুকিয়ে তাঁর বক্তব্যের 'ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা' আদায়ের চেষ্টা করেছেন। কোরানের আয়াতগুলি হচ্ছে : We have sent you (Rashad) as a deliverer of good news, as well as a warner. [25:56][১৬] Most assuredly, you (Rashad) are one of the messengers. [36:3][১৭] Are they saying, "He (Rashad) has fabricated lies about GOD!"? If GOD willed, He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of the innermost thoughts. [42:24][১৮] এবং Your friend (Rashad) is not crazy. [81:22][১৯]। অথচ ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকির-এর মত বিশ্বখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক[২০] ও আমাদের দেশের বাংলা অনুবাদকের কেউই এই আয়াতগুলিতে 'Rashad' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি দাবি করেন : "ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ 'শেষ নবী' (last Prophet) হলেও শেষ রসুল (last messenger) ছিলেন না। কোরানের ৩৩ নং সুরা আহজাবের ৪০ নম্বর আয়াতে মুহাম্মদকে (সাঃ) শেষ নবী বলা হলেও 'শেষ' রসুল বলা হয়নি। আল্লাহ ফেরেশতা এবং মানুষের মধ্যে থেকে রসুল মনোনীত করেন। (সুরা ২২, হজ, আয়াত ৭৫)।" এরপর নিজেকে 'রসুল' বলে দাবি করে কোরানের সুরা আল-ই-ইমরান-এর ৮১ নম্বর আয়াত উপস্থাপন করেন, যেখানে আল্লাহ ভবিষ্যতে একজন রসুল পাঠানোর ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। আর সুরা তওবার শেষের দুটি আয়াতকে (১২৮ ও ১২৯) 'মিথ্যে দাবি' করে তাঁর নিজের অনুবাদের কোরান থেকে বাদ দিয়ে দেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, রাশেদ খলিফার এসব দাবি-বক্তব্য সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে কট্টরপন্থীদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে রাশেদ প্রথাগত মুসলমানদের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছান।

১৯৬৯ সালের দিকে রাশেদ খলিফা কোরান শরিফের শব্দমালা, অক্ষর-বর্ণ ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্য একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরির প্রচেষ্টা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে ঘোষণা করেন : তিনি কোরানের ৭৪ নং সুরা মুদ্দাচ্ছির-এর ৩০ নং আয়াতে উল্লেখিত '১৯' থেকে

এমন একটি গাণিতিক থিওরি আবিষ্কার করেছেন যা কোরানকে একদম 'অলৌকিক' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে; যেমন তাঁর দাবি হচ্ছে : 'কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য, কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। কোরানে উল্লেখ করা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' শব্দের মধ্যে ১৯টি অক্ষর রয়েছে। কোরানের প্রথম ওহি ৯৬ নং সুরা আলাক-এ ১৯টি শব্দ রয়েছে, ঐ সুরা আলাকটি শেষের দিক থেকে গণনা করলে ১৯তম অবস্থানে রয়েছে; এবং সর্বশেষ ওহি (১১০) সুরা নাসর-এর প্রথম আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।' ইত্যাদি।[২১]

রাশেদ খলিফার এই দাবি প্রথম দিকে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী মহলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'Scientific American'-এ 'কোরানের কৌশলী পাঠ' বলে প্রথম মন্তব্য করেন আমেরিকার বিখ্যাত গণিতবিদ-বিজ্ঞানী মার্টিন গার্ডনার (Martin Gardner)। মার্টিন গার্ডনার পরে আরও বিস্তারিতভাবে রাশেদ খলিফা এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন করেন।[২২] তিন বছর পর ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে কানাডার 'Council on the Study of Religion' তাদের 'Quarterly Review' পত্রিকায় রাশেদ খলিফা'র আবিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করে : "an authenticating proof of the divine origin of the Quran."
১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি মিশরের 'Akher Sa'a' ম্যাগাজিনে রাশেদ খলিফার গবেষণার খবর প্রথম প্রকাশ করে। একই পত্রিকায় নভেম্বর ২৮, ১৯৭৩ এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে ঐ গবেষণার আপডেট প্রকাশ করা হয়। এরপর সারা বিশ্বেই বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বইয়ে রাশেদ খলিফা এবং তাঁর আবিষ্কারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে 'ইসলাম ধর্মের রসুল' দাবিকারী রাশেদ খলিফার বিরুদ্ধে ১৬ বছরের এক মেয়েকে 'যৌন নির্যাতন-নিপীড়ন-উত্যক্ত' করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারিণীর দাবি, জাতিসংঘের একটি গবেষণা প্রজেক্টে কাজ করার সময় রাশেদ খলিফা তাঁর উপর 'যৌন নির্যাতন-নিপীড়ন' চালিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে রাশেদ খলিফা আমেরিকার 'National Academy of Science'-এর বিরুদ্ধে ৩৮ মিলিয়ন ডলারের মামলা করেন 'Science and Creationism' নামক বিবর্তন তত্ত্বের ওপর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য, যে গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Evolution is a Godless process." পরবর্তীতে অবশ্য রাশেদ খলিফার এ মামলা কোর্ট খারিজ করে দেয়।

১৯৯০ সালের ৩১ জানুয়ারি আমেরিকার অ্যারিজোনা রাজ্যের টুকসন মসজিদের ভিতর ৫৪

বছর বয়সী রাশেদ খলিফার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর সারা শরীরে ছুরি দিয়ে ২৯ বার জখম করা হয়েছিল এবং চেহারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে মুখমণ্ডল দেখে চেনাই যাচ্ছিল না। রাশেদের হত্যাকারী হিসেবে আমেরিকার 'জামাতুল ফুরকা' নামের একটি মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের দিকে অভিযোগের আঙুল ওঠে।

কোরান সম্পর্কে রাশেদ খলিফার অভিমত :

> "কোরান হলো আল্লাহর 'ফাইনাল টেস্টামেন্ট'। নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর কোরানে মিথ্যা আয়াত ঢুকিয়ে বিকৃত করা হয়েছে, সময়ানুসারে কোরানের সুরা সাজানো হয়নি। খলিফা ওসমান কোরান সংকলনের জন্য যে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন সাহাবিদের দিয়ে, তাঁরা ভুল করেছেন। হজরত আলী কোরান সংকলন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু কোরানকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। তারপর ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে মারওয়ান ইবনে আল হাকাম (মৃত্যু ৬৫ হিজরি/৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ) হজরত ওমরের কন্যা হাফসার কাছে রক্ষিত নবী মুহাম্মদের নিজ হাতে লেখা 'প্রকৃত কোরান' ধ্বংস করে ফেলেন। আজকে সারা বিশ্বে মোটামুটি একই স্টান্ডার্ডের কোরান অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা তৈরি হয়েছিল মিশরের কায়রোতে ১৯২৪ সালে। হজরত ওসমানের সময়কার সংকলিত কোরানের দুটি কপি পাওয়া গেছে উজবেকিস্তান (তাশখন্দ শহর) এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর থেকে; এগুলি থেকে দেখা গেছে এখানেও মনুষ্যকৃত ভুল রয়েছে। ১৯২৪ সালের মিশরীয় সংস্করণে তা শুদ্ধ করা হয়। এরপর সৌদি বাদশা ফাহাদ কোরানের আরেকটি সংস্করণ বের করেন। আজকে কোরানের সকল মাসহাফকে যে একই রকম বলে দাবি করা হয়, তা সত্য নয়। বিভিন্ন পার্থক্য নিয়ে পৃথক রকমের কোরানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল।"[২৩]

তাই বিকৃত হয়ে যাওয়া কোরানকে উদ্ধার করে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রকৃত বাণী পৌঁছানোর জন্য নিজ উদ্যোগে রাশেদ কোরানের নতুন একটি অনুবাদ তৈরি করেন।

রাশেদ খলিফার কোরান সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য, নতুন ধর্মমত তৈরি, নিজেকে রসুল বানানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্টই ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও উনিশ মিরাকল সম্পর্কে তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি চমৎকার। কোরানে অলৌকিকতা রয়েছে বলে যে 'হিসাব' তিনি দেখিয়েছেন তা প্রথম দেখাতে মুসলমান-অমুসলমান অনেককেই বিভ্রান্ত করতে পারে। হুট করে এই মিরাকলের পিছনের কারিগরি বোঝা কষ্টকর। রাশেদ খলিফার কোরানের ১৯ মিরাকল নিয়ে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে, যেমন : মেজর কাজী জাহান মিয়া লিখিত '*আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ*' নামক দুই খণ্ডের বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে এই ১৯ মিরাকল।[২৪] লেখকের উচ্চ প্রশংসা করে বইটির প্রথমেই একটি অভিমত দিয়েছেন মাসিক *মদীনা*'র সম্পাদক, বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহিউদ্দীন। ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান লিখিত '*কমপিউটার ও আল কুরআন*' নামক বইটিতে

স্থান পেয়েছে ১৯-এর ম্যাজিক।[২৫] আল-কোরআন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ কোরানের একটি বাংলা অনুবাদ করেছেন।[২৬] কোরানের বাংলা অনুবাদের প্রথমে তিনি রাশেদ খলিফার ১৯ ম্যাজিক হাজির করেছেন ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে। এছাড়া বিভিন্ন মফস্বল শহরের স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, ছোটকাগজে এই ১৯ ম্যাজিকের কথা বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশের একটি মফস্বল শহরে বিজ্ঞান আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা কত শতবার এই '১৯ ম্যাজিক' প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের এই প্রবন্ধটিতে রাশেদ খলিফা ঘোষিত 'কোরানের উনিশ ভোজভাজি' নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করা হবে, যুক্তি দিয়ে উদ্ঘাটন করা হবে 'কোরানের গ্রেট মিরাকল' ৭৪:৩০ নং আয়াতের যথার্থতা।

রহস্যের চাবিকাঠি : কোরানের ৭৪:৩০ নং আয়াত

দাবি : "সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে আল-কোরানে উনিশ সংখ্যার ফর্মুলার কথা বলা হয়েছে।"

৭৪:৩০ নম্বর আয়াত : "আ'লাইহা তিসআ'তা আ'শারা"—অর্থাৎ ইহার উপর উনিশ। এ বাক্যাংশে 'ইহার' বা 'তাহার' কথাটি রয়েছে। এখন 'ইহার' বা 'তাহার' দ্বারা কী বা কাকে বোঝানো হচ্ছে জানতে হলে অবশ্যই এর আগের-পরের বাক্যগুলোতে ফিরে যেতে হবে, বিবেচনায় আনতে হবে। মনে রাখতে হবে এ আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে নাজিল হয়নি। আর বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটা আয়াতকে এভাবে উপস্থাপন করলে কি দাঁড়ায়, দেখা যাক : 'নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।' (১০৩:২)। এই আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করলে এর অর্থ যা দাঁড়ায় তা অর্থহীন এবং ঐ সুরার মূলভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। এবার এর আগের ও পরের আয়াত দেখি : 'শপথ যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে।' অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে সকল মানুষ নয় বরং যারা আল্লাহতে ঈমান আনেনি তারাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে কোরানের আয়াতগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করলে তা অনেক ক্ষেত্রেই কোরানের মূলভাবের সাথে সাংঘর্ষিক, অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমরা যদি সুরা মুদাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতটির অর্থ বুঝতে চাই তবে অবশ্যই এই আয়াতের আগের ও পরের আয়াত আমাদের বিবেচনায় আনতেই হবে।

আলোচনার সুবিধার্থে বিস্তারিতভাবে এখানে সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১নং আয়াত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ অনুবাদকের অনুবাদ ও সেই সাথে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসিরকারকদের তফসির তুলে ধরা হলো:

(১) আল-কোরানের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকির সুরা

মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১নং আয়াত অনুবাদ করেছেন এভাবে :

074.027
YUSUFALI: And what will explain to thee what Hell-Fire is?

PICKTHAL: Ah, what will convey unto thee what that burning is!

SHAKIR: And what will make you realize what hell is?

074.028
YUSUFALI: Naught doth it permit to endure, and naught doth it leave alone!

PICKTHAL: It leaveth naught; it spareth naught

SHAKIR: It leaves naught nor does it spare aught.

074.029
YUSUFALI: Darkening and changing the colour of man!

PICKTHAL: It shrivelleth the man.

SHAKIR: It scorches the mortal.

074.030
YUSUFALI: Over it are Nineteen.

PICKTHAL: Above it are nineteen.

SHAKIR: Over it are nineteen.

074.031
YUSUFALI: And We have set none but angels as Guardians of the Fire; and We have fixed their number only as a trial for Unbelievers,- in order that the People of the Book may arrive at certainty, and the Believers may increase in Faith...

PICKTHAL: We have appointed only angels to be wardens of the Fire, and their number have We made to be a stumbling-block for those who disbelieve; that those to whom the Scripture hath been given may have certainty, and that believers may increase in faith...

SHAKIR: And We have not made the wardens of the fire others than angels, and We have not made their number but as a trial for those who disbelieve, that those who have been given the book may be certain and those who believe may increase in faith...

ইংরেজি অনুবাদকগণ স্পষ্টই বলেছেন সুরা মুদ্দাচ্ছিরে ৩০নং আয়াতটিতে শুধুমাত্র দোজখের উনিশজন ফেরেশতার সংখ্যার কথাই বলা হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়।

(২) উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আশরাফ আলি থানভী রচিত '*বয়ানুল কোরআন*'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদে রয়েছে[২৭]:

> "আপনি জানেন কি দোজখ কি বস্তু? (২৭) উহা (কাহাকেও উহাতে প্রবেশ করার পর অদগ্ধ) থাকিতে দিবে না—এবং (অনাগত কোনও কাফেরকে বাহিরে) ছাড়িবে না। (২৮) উহা (পোড়াইয়া) দেহের সৌষ্ঠব বিকৃত করিয়া দিবে। (২৯) উহার উপর উনিশজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) থাকিবেন। (৩০) আর আমি দোজখের কর্মচারী কেবল ফেরেশ্তাদিগকেই নিযুক্ত করিয়াছি। আর আমি তাহাদের সংখ্যা এইরূপে রাখিয়াছি যাহা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, (আর এই জন্য) যেন বিশ্বাস করে—কিতাবীগণ এবং ঈমানদারদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। (৩১)।" (সুরা ৭৪, মুদ্দাচ্ছির, আয়াত ২৭-৩১)।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই সুরা মুদ্দাচ্ছিছারের ৩০ নং আয়াতের অনুবাদে উল্লেখ করা আছে : 'উহার উপর উনিশজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) থাকিবেন।' অর্থাৎ দোজখের বর্ণনার মধ্যে যে 'উনিশ' রয়েছে তা কোনো কোরানের অলৌকিক ফর্মুলা বা কোনো কোড নয় বরং দোজখের শাস্তিপ্রদানকারী উনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে, যা ৩১নং আয়াত পড়লেই বুঝা সম্ভব।

এবার এই আয়াতগুলির শানে নুজুল লক্ষ্য করি :

> "৩০নং আয়াতটি শ্রবণ করিয়া আবুল আসাদ নামক জনৈক শক্তিশালী কাফের বলিয়া উঠিল, হে কোরাইশ জাতি! তোমরা ইহাতে ভীত হইও না। আমি দশজন ফেরেশ্তাকে ডান বাহু দ্বারা এবং নয়জনকে বাম বাহু দ্বারা পরাজিত করিয়া দিব।

অন্য রেওয়াতে আছে, এই আয়াতটি শুনিয়া আবু জাহাল বলিল, ভয় কিসের? ফেরেশ্‌তারা মাত্র উনিশজন। তোমরা সংখ্যায় অনেক রহিয়াছ। প্রতি দশজন মানুষও কি একজন ফেরেশ্‌তাকে হঠাইয়া দিতে পারিবে না? এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়। (দ্রষ্টব্য: *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ* (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), পৃষ্ঠা ৯৪২)।

শানে-নুজুল থেকে এটা পরিষ্কার যে রাশেদ খলিফা প্রদত্ত 'মিরাকল উনিশ' আয়াতটিতে দোজখের শাস্তিপ্রদানকারী উনিশজন ফেরেশতার কথাই বলা হয়েছে এবং এটা বলার জন্যই এ আয়াতগুলো রচিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কোরানে যদি কোনও সংখ্যার ফর্মুলা (মিরাকল বা ম্যাজিক ইত্যাদি) থাকে তবে তা দোজখের মধ্যে বর্ণিত হবে কেন? এটা তো একটি সুসংবাদ, যা বেহেশতের বর্ণনাতে থাকাই স্বাভাবিক ছিল।

(৩) আলহাজ্জ মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী 'বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ'-এ সুরা মুদ্দাচ্ছির-এর ২৭-৩১ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে[২৮] :

"(২৭) তুমি কি বুঝ?—এই ছাকার কি? (২৮) এমন আগুন—যা কিছুই বাকি রাখবে না, এবং ছাড়বেও না। (২৯) মানুষকে ঝলসে দেবে। (৩০) সেখানে উনিশ জন রয়েছে। (৩১) ফিরেশতাদের ছাড়া কাউকে জাহান্নামে মোতায়েন করিনি। আমি তাদের সংখ্যা স্থির করেছি-শুধু কাফিরদের পরীক্ষার জন্য!"

(৪) বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত '*তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*'-এ সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে[২৯] :

"(২৭) আপনি কি বোঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছেন উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তার এই সংখ্যা করেছি।"

এখানেও দেখা যাচ্ছে অনুবাদক স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, এখানে 'উনিশ' দ্বারা কোনো ফর্মুলা নয় বরং উনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে।

তফসিরকারক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "তফসিরবিদ মুকাতিল বলেন : এটা আবু জাহ্‌লের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশজন ফেরেশতা, তখন কোরায়শ যুবকদের সম্বোধন করে বলল : মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশজন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন : উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাজিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরায়শ কাফের বলে উঠল : হে কোরায়শ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশজনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান

বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্‌সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় : আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমত ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।" (দ্রষ্টব্য : তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা ১৪২১)।

অর্থাৎ 'উনিশ' সংখ্যাটা যে ফেরেশতাদের সংখ্যা মাত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

(৫) নাসিম উদ্দিন আহমদ অনূদিত কোরান শরিফের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে 'উনিশ'-এর ব্যাখ্যায় (পাদটীকায়) বলা হয়েছে[৩০]: 'জাহান্নামের উনিশ জন রক্ষক।'—'Nineteen guardians of the Fire.'

(৬) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী-এর 'তাফহীমুল কুরআন'-এ সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১ নম্বর আয়াত অনুবাদ করা হয়েছে[৩১] : "(২৭) আর তুমি কি জান, সেই দোযখটি কি? (২৮) উহা কাহাকে জীবিত রাখে না আবার মৃতাবস্থায়ও ছাড়িয়া দেয় না। (২৯) চামড়া ঝলসাইয়া দেয়। (৩০) উনিশজন কর্মচারী সেখানে নিয়োজিত। (৩১) আমরা উহা দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদিগকে বানাইয়াছি। আর তাহাদের সংখ্যাকে কাফিরদের জন্য একটা পরীক্ষা-মাধ্যম বানাইয়া দিয়াছি।"

তফসিরে বলা হয়েছে : "লোকেরা রাসূলে করীম (স)-এর মুখে শুনিতে পাইয়াছিল যে, দোযখের কর্মচারীর সংখ্যা হইবে মাত্র উনিশজন। এই কথা শোনামাত্রই তাহারা এই কথার উপর ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। এমনকি, এই কথা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে, একদিকে আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, আদম (আ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার যত মানুষ কুফরী ও নাফরমানী করিয়াছে তাহারা সকলেই দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। আবার সেই সঙ্গেই আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, এতবড় একটা বিশাল-বিরাট দোযখে এত অসংখ্য মানুষকে আযাব দেওয়ার কাজে মাত্র ১৯ জন কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে! এই কথায় কুরাইশ সরদাররা প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ভাঙিয়া পড়িল। আবূ জেহেল বলিল : 'ভাই সব! তোমরা কি এতই দুর্বল ও অর্থব হইয়াছ যে, তোমরা দশ-দশ জন লোক মিলিয়াও দোযখের এক একজন কর্মচারী ও সিপাহীর মুকাবিলা করিতে পারিবে না?' বনু জুমাহ গোত্রের একজন পাহলোয়ান বলিয়াই ফেলিল : '১৭ জনের সহিত তো আমি একাকীই মুকাবিলা করিব, অবশিষ্ট দুই জনকে তোমরা কাবু করিয়া লইবে।' এই ধরনের অত্যন্ত হাস্যকর কথাবার্তার জওয়াবে এই বাক্যটি একটি মধ্যবর্তী কথা হিসাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।" (দ্রষ্টব্য : *তাফহীমুল কুরআন*, ১৮শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮)।

(৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক কোরান শরিফের অনুবাদে সুরা মুদ্দাচ্ছির এর ২৭-৩১

নম্বর পর্যন্ত আয়াত অনুবাদ করা হয়েছে এ রকম[৩২] : "(২৭) তুমি কি জান সাকার কী? (২৮) উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না ও মৃত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না। (২৯) ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করিবে। (৩০) সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশজন প্রহরী। (৩১) আমি ফিরিশ্‌তাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদিগের পরীক্ষা স্বরূপই আমি উহাদিগের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি।"

(৮) সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসির '*তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*'-এ এই আয়াতগুলো প্রসঙ্গে বলা হয়েছে[৩৩] : "দোযখের প্রহরী থাকে 'উনিশ জন'। এই ফেরেশতারা ব্যক্তি না গোষ্ঠী, তা আমরা জানি না।" (পৃষ্ঠা ২৩৩)। "মোশরেকরা যে উনিশজনকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করেছিল তার রহস্য নিয়েই আয়াতটি শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমি দোযখের দায়িত্বশীল হিসেবে ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে নিযুক্ত করিনি।" (পৃষ্ঠা ২৩৪)।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে দেখলাম সকল ইসলামি চিন্তাবিদ, তফসিরকারকের মতানুসারে সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত 'উনিশ' কোনো ফর্মুলা বা কোড নয়। বরং তা দ্ব্যর্থহীনভাবে দোজখের (সাকার) প্রহরী উনিশজন ফেরেশতার কথা বোঝাচ্ছে।

কোরানের সুরা সংখ্যা

দাবি : "কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।"

বর্তমানে বহুল প্রচলিত কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪ হলেও অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ খলিফা উসমানের 'কোরান সংকলন কমিটি' কর্তৃক প্রণীত কোরানের সুরা সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করে আসছেন। তাঁরা সুরা ফালাক ও নাস কোরানের অংশ বলে মনে করেন না। তারা বলেন : "একটা কেশে কয়েকটি গ্রন্থি দিয়ে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (স.) ন্যায় মহারাসুলের দিব্যজ্ঞানের বিকার ঘটানো যদি লাবীদের ন্যায় একজন নগণ্য ইহুদির পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহলে জগতের অভিধান হতে 'অসম্ভব' কথাটা চিরকালের জন্য মুছে যাওয়া উচিৎ। কোরানের একটি আয়াতে এই মতের সমর্থন হচ্ছে—সুরা ফোরকানে বর্ণিত হয়েছে 'এবং অত্যাচারী (কাফের)গণ (মুসলমানদিগকে সম্বোধন করে) বলে, তোমরা তো একজন জাদু ও মায়াবিষ্ট লোকের অনুসরণ করছ মাত্র। দেখ, তারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ উপমার সৃষ্টি করেছে, এর ফলে তারা ভ্রষ্ট হয়ে গেল, সুতরাং তারা আর পথ পেতে সমর্থ হবে না।' (১ম রুকু) এই আয়াত হতে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, 'হজরতকে কেউ যে জাদু করেছে', আরবের কাফেরগণই এরূপ কথা বলত। এই আয়াতে ঐ প্রকার উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করে ঐ মিথ্যাপ্রচারকদিগকে অত্যাচারী ও ভ্রষ্ট বলা হচ্ছে। কোরানে 'তা-হা' সুরায় হজরত মুসা এবং

ফেরআওনের জাদুকরদিগের ঘটনা বর্ণনার পর বলা হয়েছে-জাদুকরগণ কুত্রাপি সফলতা লাভ করতে পারে না।"[৩৪]

অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদকে জাদু করা হয়েছিল এবং এ জাদু থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে সুরা ফালাক ও সুরা নাস নাজিল হয়েছে, এমন ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। মাওলানা আকরাম খাঁ হজরত মুহাম্মদ (দ.)-এর ওপর জাদুর প্রভাব হওয়া সম্পর্কে বলছেন : "এই সুরা দুটিকে (ফালাক ও নাস) অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে গেছে। সাহাবী আব্দুল্লাহ এবন-মাছউদ এ সুরা দুটিকে কোরানের অংশ বলে স্বীকার করেননি। নিজের মুসাবিদায় সুরা দুটি লিপিবদ্ধ করেননি এবং সমস্ত সাহাবীর মতের ও স্পষ্ট হাদিসগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন দৃঢ়ভাবে নিজের মত কায়েম রেখেছেন।" (দ্রষ্টব্য : *ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক*, পৃষ্ঠা ১৯৪)। তাহলে সুরা ফালাক ও নাসকে সঙ্গত কারণেই বর্জন করে আমরা কোরানের সুরা সংখ্যা ১১২টি বলতে পারি।

সুরা 'ফাতিহা' কী কোরানের অংশ, এ নিয়ে অনেক মুসলমানের মধ্যে সংশয়-দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে যুক্তি হচ্ছে, সুরা ফাতিহা পাঠে বুঝা যায় এটা আল্লাহর কথা নয়, এটা মানুষের কথা; আল্লাহ কখনো বলবেন না, 'আমাকে সরল পথ দেখাও' অথবা 'আমি শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।'

নবম সুরা 'তওবা' সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রচিত বয়ানুল কোরানে রয়েছে : "এই সুরাটি ইহার পূর্ববর্তী সুরা সুরায়ে আনফালের অংশ হওয়ার এবং স্বতন্ত্র সুরা না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই অনিশ্চয়তার দরুন ইহার প্রথমে বিসমিল্লাহ লেখা হয় নাই।" (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ* (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), পৃষ্ঠা ৩০৩)। এ প্রসঙ্গে '*তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*'-এ উল্লেখ আছে : "একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' নাযিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হত, অতঃপর অপর সূরা শুরু হল। কোরআন মজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষ নাজিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ নাযিল হয়, না রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা লিখে নেয়ার জন্যে ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়। কোরআন সংগ্রাহক হযরত ওসমান গনী (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সুরার বরখেলাফ সুরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোনো সুরা নয় বরং অন্য কোনো সুরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সুরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সুরা আনফালের অংশ বলাই সঙ্গত।" (দ্রষ্টব্য : *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, পৃষ্ঠা ৫৫২)।

"সুরা তওবা স্বতন্ত্র সুরা না হয়ে সুরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে

বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোন সুরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা।" (দ্রষ্টব্য : *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, পৃষ্ঠা ৫৫৩)।

তাহলে সুরা তওবা ও সুরা আনফাল একই সুরার অংশ না-কী দুটি ভিন্ন সুরা তা অমীমাংসিত।

সুরা ফীল ও সুরা কোরাইশ নিয়েও রয়েছে এরকম বির্তক। '*তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*'-এর ১৪৭৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : "এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা (কোরাইশ) সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লেখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হজরত ওসমান (রাঃ) যখন তাঁর খেলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয়। হজরত ওসমান (রাঃ)-এর তৈরি এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।" অর্থাৎ সুরা ফীল ও সুরা কোরাইশ একই সুরা না-কী দুটি ভিন্ন সুরা তা নিয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, কোরানের সুরা সংখ্যা যেমন হতে পারে ১১৪টি, তেমনি তা হতে পারে ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২ বা ১১৩টি এবং সবগুলোর পক্ষেই দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে; এবং এগুলো কোনোটাই (১১৪ ব্যতীত) ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। তাই যারা কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪টি বলেন এবং একে স্থির ধরে শুধুমাত্র ১৯ দিয়ে বিভাজ্যতার কারণে এর পিছনে অলৌকিকত্ব খুঁজেন তাদের এ ধরনের অপচেষ্টার উদ্দেশ্য বুঝতে বাকি থাকে না।

কোরানের আয়াত সংখ্যা

দাবি : "কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৩৩৪=৬৩৪৬) এবং এ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল ১৯ (৬+৩+৪+৬=১৯)।"

মিশরীয় বংশোদ্ভূত রাশেদ খলিফার আবিষ্কৃত 'উনিশ সংখ্যার মোজেযা'র অনেক একনিষ্ঠ অনুরাগী বাংলাদেশে আছেন। তাঁরা কেউবা 'কোরানিক ১৯ সংখ্যার' মিরাকলে আপ্লুত হয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন কোরানের অলৌকিকত্ব প্রচারের জন্য, কেউবা ওপেন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন কোরানকে 'অলৌকিক' দাবি করে। বাংলাদেশের এরকম একজন অনুরাগী হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ। তিনি নিজেও কোরান বাংলাতে অনুবাদ করেছেন। আমরা হিসেব করে দেখেছি তাঁর অনূদিত কোরানে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের অনূদিত কোরানের সরল বঙ্গানুবাদেও একই সংখ্যক আয়াত

রয়েছে। ইউসুফ আলীর অনূদিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৯। হাফেজ মুনির উদ্দীন বা বাংলাদেশে ১৯-মিরাকল প্রচারকারীরা কী জানতেন রাশেদ খলিফা কোরানের নিজস্ব অনুবাদের নবম সুরা তওবা'তে শেষের দুটি আয়াত (১২৮ ও ১২৯) কেটে বাদ দিয়েছেন? কারণ (রাশেদ খলিফার মতে) : "উক্ত আয়াত দুটি মিথ্যা। সুরা তওবা মদিনাতে নাজিল হয়েছিল আর ঐ শেষের আয়াত দুটি অনেক আগে মক্কায় থাকতে বলা হয়েছিল। তাহলে এই আয়াত দুটি সুরা তওবার শেষে গেল কিভাবে? আবার এই আয়াতের সাক্ষী হিসেবে দুজনের কথা জানা যায়, যারা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নন।"[৩৫] ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকিরসহ স্বনামধন্য কোরানের ইংরেজি অনুবাদকেরা সুরার তওবা'র আয়াত সংখ্যা ১২৯ দিয়েছেন। তাদের অনূদিত আয়াত দুটি নীচে তুলে দেওয়া হলো[৩৬] :

009.128

YUSUFALI: Now hath come unto you a Messenger from amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful.

PICKTHAL: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful.
SHAKIR: Certainly a Messenger has come to you from among yourselves; grievous to him is your falling into distress, excessively solicitous respecting you; to the believers (he is) compassionate,

009.129
YUSUFALI: But if they turn away, Say: "Allah sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"

PICKTHAL: Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no Allah save Him. In Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.

SHAKIR: But if they turn back, say: Allah is sufficient for me, there is no god but He; on Him do I rely, and He is the Lord of mighty power.

রাশেদ খলিফার অনূদিত কোরানে নবম সুরা তওবা'র আয়াত সংখ্যা ১২৭টি।[৩৭] হাফেজ মুনির উদ্দীনের কোরানেও সুরা তওবার শেষের আয়াত দুটি আছে : "(১২৮) (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে, তোমাদের কোনরকম কষ্ট ভোগ তার কাছে দুঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু। (১২৯) এরপরও যদি এরা (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের খোলাখুলি) বলে দাও, আল্লাহতায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের একচ্ছত্র অধিপতি।"

রাশেদ খলিফা যে কোরানকে 'আল্লাহর বাণী' বলে দাবি করলেন এবং সেই কোরানই তাঁর মতে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই বিকৃতি থেকে উদ্ধারের জন্য দুটি আয়াত কেটে কমিয়ে নিজেই নতুন করে 'ইচ্ছেমত' কোরান অনুবাদ করছেন। পনেরশত বছর পর এই ধরনের অভিযানের শুদ্ধতা-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠতে পারে। তবে মূলে যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা হল—এ রকম না হলে কোরানের অলৌকিকতা, '১৯ মিরাকল' দেখানো যাচ্ছে না।

হাফেজ মুনির উদ্দীন কোরানের আয়াত সংখ্যার যে হিসাব দিয়েছেন, তা হলো : "হজরত আয়েশা (রা.)-এর মতে ৬৬৬৬, হজরত ওসমান (রা.)-এর মতে ৬২৫০, হজরত আলী (রা.)-এর মতে ৬২৩৬, হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে হজরত আয়েশার (রা.) গণনাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।" (দ্রষ্টব্য : কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১১)।

দেখা যাচ্ছে কোথাও (রাশেদ খলিফা প্রদত্ত) কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ বলা হয় নাই।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম কোরানের আয়াত সংখ্যার বিষয়ে যে অভিমত দিয়েছেন তা এরকম[৩৮] : "কোরানের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারের মত। শায়খ আদ-দানী (রা.) বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ একমত যে কোরানের আয়াত সংখ্যা মোটামুটি ছয় হাজারের মত। তবে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এই ছয় হাজারের পরে কত সংখ্যা বেশি আছে তা নিয়ে। এ বিষয়ে ছয়টি মত পাওয়া যায় :

১. পূর্ণ ছয় হাজার; না বেশি, না কম।
২. ৬ হাজার ২শত ৪টি।
৩. ৬ হাজার ২শত ১৪টি।
৪. ৬ হাজার ২শত ১৯টি।
৫. ৬ হাজার ২শত ২৫টি।

৬.৬ হাজার ২শত ৩৬টি।

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা—

৭. মুসনাদ দায়লামীর এক বর্ণনায় আছে কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ২শত ১৬টি।

৮. ইবনুদ দুরীস (রা.)-এর এক বর্ণনায় জানা যায় কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ৬শত।

৯. আমাদের দেশে ও অন্যান্য মুসলিম বিশ্বে বহুল প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ৬শত ৬৬টি।

কোরানের আয়াত সংখ্যা নির্ণয়ে এ মতবিরোধ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠবে। সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাধারণভাবে গণ্য করা হয় ৭টি। কিন্তু ইমাম হাসান (রা.)-এর মতে আয়াত সংখ্যা ৮টি। তিনি 'বিসমিল্লাহ'-কেও একটি আয়াত গণ্য করেছেন। আবার কারও কারও মতে সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা ৬টি। এ মতানুযায়ী ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয় মিলে এক আয়াত এবং বিসমিল্লাহ আয়াত নয়। আবার কারো কারো মতে সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা ৯টি।

তবে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কোরানের প্রতিটি সুরার প্রারম্ভে প্রতিটি সুরার যে আয়াত সংখ্যা উল্লেখিত আছে তা এক সঙ্গে যোগ করা হলে মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬টি আর 'বিসমিল্লাহ'-কে প্রতিটি সুরার এক একটি আয়াত গণ্য করা হলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬+১১৩ = ৬৩৪৯টি।"

পৃথিবীর এতো জ্ঞানী-গুণী ইসলামি পণ্ডিত থেকে শুরু করে আলেম-ওলামা-মাওলানা কেউই কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ বলেননি। যা রাশেদ খলিফা 'কোরানের মিরাকল' প্রমাণের জন্য উপস্থাপন করেছেন। আমরা কী বলতে পারি রাশেদ খলিফা সম্পূর্ণ স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য অযৌক্তিকভাবে কোরানের আয়াত সংখ্যার মনগড়া হিসাব দাখিল করেছেন; যেমন করে তিনি নিজের অনূদিত কোরানে সুরা ফুরকানের ৫৬ নম্বর আয়াত, সুরা ইয়াসিনের ৩ নম্বর আয়াত, সুরা শুরা'র ২৪ নম্বর আয়াতে এবং সুরা তাক্‌ভির'র ২২ নম্বর আয়াতে ব্রাকেটে নিজের নাম 'রাশেদ' ঢুকিয়ে দিয়েছেন, নিজেকে 'রসুল' হিসেবে প্রমাণের জন্য। দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন, বাংলাদেশে মেজর জাহান মিয়া, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের মত পণ্ডিতরা কি বহুল প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যার সাথে রাশেদ খলিফাকৃত কোরানের আয়াত সংখ্যার গরমিল বা আয়াত কেটে কমিয়ে দেওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? অবগত থাকলে, তবে কেন এই ধরনের গরমিল নিয়ে 'কোরানের মিরাকল' প্রমাণের অপচেষ্টায় শামিল হলেন? আবার জানা না থাকলে, কোনো ব্যক্তির 'মিরাকল থিওরি' নিয়ে নিজেই পূর্ণ তথ্য না জেনে কি কারণে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন? অর্থাৎ 'মিরাকল-ফেরিওয়ালা'র মত তাঁরাও

এর দায়ভার এড়াতে পারেন না।

কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ও তার বর্ণ সংখ্যা

দাবি : "কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ১১৪ বার এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। এছাড়া 'বিসমিল্লাহ'-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।"

বর্তমানে কোরানে যুক্ত জের-জবর-পেশ-তাশদীদ-মদ ইত্যাদি নবী মুহাম্মদের কোরানে অস্তিত্ব ছিল না। হজরত ওসমান কর্তৃক সংকলিত-সম্পাদিত কোরানেও সমরূপ ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা করে পাঠ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। স্বরবর্ণের ব্যবহার ছিল না। সকলেই জানেন, আরবি বর্ণমালায় ২৯টি বর্ণ রয়েছে; এর মধ্যে ২৬টি বর্ণ বর্তমানে ব্যঞ্জনবর্ণরূপে গণনা করা হয় এবং বাকি তিনটি বর্ণ (আলিফ, ওয়াও, ইয়া) স্বরবর্ণ হিসেবে গণনা করা হয়। কিন্তু স্বরবর্ণ তিনটি প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণরূপেই ধরা হত; পরে 'আলিফ, ওয়াও, ইয়া' তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেকের (মৃত ৭০৫) সময় গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কোরানের পঠন-লিখনের এ সমস্যা দূর করার জন্য প্রথম ইরাকের বসরা নগরীর সুফি পণ্ডিত হাসানকে অনুরোধ করেন। হাসান জনৈক বসরাবাসী ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামারকে নিয়োগ করেন। ইয়াহিয়াই প্রথমে সিরিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত স্বরচিহ্ন এবং নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ডট পদ্ধতির ব্যবহার আরবি বর্ণলিপিতে শুরু করেন; হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের পার্থক্য, যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ, ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যে সমরূপতা ছিল তার পার্থক্য ও শব্দ নির্ধারণ করেন। এরপর ধীরে ধীরে একটি বাক্যে শব্দের মধ্যে বিভক্তি, কমা, পূর্ণ ছেদ, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি বিরামচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু আরবি বর্ণলিপি বা লিখন পদ্ধতিতে এই নতুন জিনিস আমদানি সর্বজন কর্তৃক গৃহীত হয়নি। কট্টরপন্থীদের আপত্তি ছিল 'ঐসব ডট ও স্বরচিহ্ন পবিত্র কোরানের ওহি নয়, এগুলো বিধর্মীদের তৈরি।' বিখ্যাত সুন্নি নেতা মালিক ইবনে আনাস (মৃত ৭৯৫) মসজিদে এই 'সংশোধিত কোরান' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। স্থানীয় আলেম-ওলামা, বাদশাহ একমত হয়ে বললেন, পূর্বের 'চিহ্নহীন' কোরানই থাকুক যেমন সিনাগগে (ইহুদিদের উপাসনালয়) তোরাহ রয়েছে। ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান মনীষী হারুন ইবনে মুসা (মৃত ৮১৩) সর্বপ্রথম আরবি শব্দভাণ্ডার প্রস্তুত করেন। এরপর পুনরায় আব্বাসীয় খলিফা ইবনে মুজাহিদ (মৃত ৯৩৬) কোরানের পঠন পদ্ধতি, উচ্চারণ, বিরাম চিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এই গোলমেলে পরিস্থিতির এখনো পূর্ণ সমাধান হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও মিশরের কায়রো থেকে প্রকাশিত কোরানের আবৃত্তি পদ্ধতি মোটামুটি সর্বজনসম্মত হলেও স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পঠন পার্থক্য আগের মতোই রয়ে গেছে।[৩৯]

এবার মূল আলোচনায় যাই। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' অর্থ 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।' স্পষ্টই এ কথাটি একজন মানুষ বলবে, আল্লাহ নয়; কারণ মুসলমানরা কোরানকে 'আল্লাহর বাণী' বলে মনে করেন। তাই 'বিসমিল্লাহ' কোরানের অংশ হতে পারে না। অনেকে মনে করেন, 'বিসমিল্লাহ' কোরানের অংশ না হলেও হজরত মুহাম্মদ কোরান পাঠের আগে বা নির্দিষ্ট অংশ শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলতেন, যা সাহাবিরা অনুসরণ করতেন। ফলে এই 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি কোরানের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আর 'বিসমিল্লাহ'-এর অর্থ যেহেতু 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি', তাই এর দ্বারা বোঝা যায় কোরান পাঠ এখনো শুরু হয় নাই, 'বিসমিল্লাহ'-এর পরই তা শুরু হতে যাচ্ছে।

তফসির '*মাআরেফুল ক্বোরআন*'-এ বলা হয়েছে : "'বিসমিল্লাহ' কোরান শরিফের সূরা নামলের একটি আয়াত বা অংশ। সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয়। 'বিসমিল্লাহ' সূরা আল-ফাতিহার অংশ, না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্নভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' সূরা নামল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়।" (পৃষ্ঠা ২)। তাই যে 'বিসমিল্লাহ' কোরানের অংশ কি-না তা নিয়েই রয়েছে ব্যাপক সন্দেহ, সেই বিসমিল্লাহর মধ্যে উনিশ মিরাকল খোঁজে কোরানকে অলৌকিক প্রমাণের প্রয়াস কতটা যৌক্তিক, তা যে কারো উপলব্ধি পারার-ই কথা।

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে দেখেছি সুরার সংখ্যা ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩ বা ১১৪-এর মধ্যে যে কোনোটিকেই ধরে নেয়া যেতে পারে। সুরা 'তওবা' বাদে বাকি সুরার প্রারম্ভের 'বিসমিল্লাহ' বিবেচনায় আনলে এবং এর সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে সুরা নমলের ৩০তম আয়াতে উল্লেখকৃত 'বিসমিল্লাহ'-কে যোগ করলে আমরা মোট 'বিসমিল্লাহ'র সংখ্যা যেমন পেতে পারি ১১৪টি, তেমনি ১১০, ১১১, ১১২ ও ১১৩টিও পেতে পারি, যাদের কোনোটিই (১১৪ বাদে) ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

তাই কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ১১৪ বার আছে এবং একে স্থির বলে ধরে নিয়ে তার মাঝে 'মোজেজা' খোঁজা শুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও বটে।

ইসলামি ভাষ্য মতে, 'কোরান আল্লাহর কাছ থেকে জিব্রাইল মারফত অথবা অন্য কোনো উপায়ে মৌখিকভাবে নাজিল হয়েছে, কোনো লিখিত দলিল আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি।' তাই কোরানের কোনো একটি বাক্যে কতটি বর্ণ আছে তা হিসেব করতে হলে মৌখিকভাবে উচ্চারিত বর্ণগুলো হিসেবে আনতে হবে, উহ্য যেসব বর্ণ লেখার সময় আসে, সেগুলো হিসেবে আনা ঠিক হবে না। যাহোক, এভাবে হিসেব করলে 'বিসমিল্লাহ'র বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩টি। যেসব বর্ণ (যেমন) দুবার উচ্চারিত হয়েছে (তাশদিদযুক্ত হরফ) সেগুলোকে দুবার গণনা করলে দাঁড়ায় ১৬টি। খাড়া জবর যা আলিফের প্রতিনিধিত্ব করে তা হিসেবে আনলে মোট বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি।

এবার 'বিসমিল্লাহ'র লিখিতরূপটিও যদি বিবেচনায় আনা যায় তবে তাশদিদযুক্ত হরফ যেহেতু দুবার উচ্চারিত হয় তাই এগুলোকে দুইবার উল্লেখিত ধরলে 'বিসমিল্লাহ'র মোট বর্ণ সংখ্যা হয় ২২টি। সেই খাড়া জবরদ্বয় যা আলিফের প্রতিনিধিত্ব করে তা হিসেব করলে মোট বর্ণের সংখ্যা হয় ২৪টি (যেহেতু 'বিসমিল্লা'য় তাশদিদযুক্ত লামের পূর্বে একটি উহ্য লাম রয়েছে তাই তাশদিদযুক্ত লামকে একবার গণনা করলে হিসাবটি দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১ ও ২৩); আর এক্ষেত্রে তাশদিদযুক্ত হরফগুলো একবার গণনা করলে দাঁড়ায় ২১টি। যদি আমরা তাশদিদযুক্ত হরফগুলোকে একবার গণনা করি আর খাড়া জবরকে বিবেচনায় না আনি এবং উচ্চারণে উহ্য বর্ণগুলোকেও হিসেবে আনি তবেই কেবল 'বিসমিল্লাহ'র মোট বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। তাই এ হিসেবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার কিছুই নেই। এছাড়া 'বিসমিল্লাহ', মূলে ছিল 'বি-ইসমিল্লাহ'; কিন্তু অধিক ব্যবহারের কারণে পরবর্তীতে মধ্যের 'আলিফ'-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন মধ্যের আলিফ বাদ দিয়ে 'বিসমিল্লাহ'-য় মোজেজা খোঁজা কতটুকু প্রাসঙ্গিক? এবং এই আলিফের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, তা পরিষ্কার নয়।

এখানে আরেকটি কথা গুরুত্বপূর্ণ, আরবি ভাষার বর্ণসংখ্যা গণনা পদ্ধতি ও লেখার পদ্ধতি নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে যার ফলে কোরানের বর্ণসংখ্যার হিসাব সম্পর্কে কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কোরান-বিশেষজ্ঞরা কোরানের বর্ণসংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে খুবই দ্বিধাবিভক্ত।

রাশেদ খলিফা শুধু 'বিসমিল্লাহ'র বর্ণ সংখ্যার মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজার চেষ্টা করেননি, 'বিসমিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলোর মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন : "কোরানে 'ইসম' শব্দটি ১৯ বার, 'আল্লাহ' শব্দ ২৬৯৮ বার, 'আর রাহমান' শব্দ ৫৭ বার এবং 'আর রাহিম' ১১৪ বার রয়েছে যাদের সবগুলোই ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।"

১৯৮৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার '*The Muslim Digest*' (জুলাই-অক্টোবর সংখ্যা) পত্রিকা রাশেদ খলিফার 'গাণিতিক চালাকি'কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে 'অনিষ্টকর উৎপথগামী' (sinister heretic) বলে মন্তব্য করেছে। তারা বলছেন : "রাশেদ খলিফার দাবি মত কোরানে 'আল্লাহ' শব্দের সংখ্যা ২৬৯৮ নয়, এটি ২,৮১১ বার; আর-রাহমান ৫৭ বার নয় বরং এটি ১৬৯ বার এসেছে।" পূর্বেও ঐ পত্রিকা (জুলাই/আগস্ট, ১৯৮১ এবং মার্চ/এপ্রিল, ১৯৮২ সংখ্যা) রাশেদ খলিফার কোরান নিয়ে ভুলভাবে 'মিরাকল' উপস্থাপনের জন্য সমালোচনা করেছে।

কোরানে 'বিসম' শব্দটি ৩ বার, আলাদাভাবে 'ইসম' শব্দটি ১৯ বার এবং 'ইসমুহু' শব্দটি এসেছে ৫ বার। তাই 'ইসম' মোট ২৭ বার। বহুবচনরূপে 'ইসম' শব্দটি এসেছে ১২ বার; অর্থাৎ মোট ৩৯ বার 'ইসম' শব্দটি কোরানে এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। 'বিসম' ও 'ইসমুহু'-এর সাথের 'ইসম' শব্দটি রাশেদ খলিফা তাঁর '১৯ মিরাকল'-এ হিসেব করেননি অথচ 'লিল্লাহ'-তে অন্তর্ভুক্ত 'আল্লাহ' শব্দটি হিসেব করেছেন। কিন্তু কেন? কারণ এটি

না করলে তাঁর '১৯ মিরাকল'-এর মিরাকল আর থাকছে না। আবার 'আর রাহিম' শব্দটি কোরানে ১১৪ বার রয়েছে, সেটি সত্য নয়। 'আর রাহিম' কোরানে এসেছে মোট ১১৬ বার (একবার বহুবচনে) যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।[৪০]

কোরানের বর্ণ ও শব্দ সংখ্যা

দাবি : "কোরানের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২৯১৫৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×১৭৩২৪=৩২৯১৫৬)।"

"সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবুদাল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-ও কোরআনের অক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর গণনা মতে কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২২,৬৭১। তাবেয়ীদের মাঝে মোজাহেদ (র.)-এর গণনা অনুযায়ী কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭ সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।" (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)। উল্লেখিত কোরানের তিনটি বর্ণ সংখ্যার কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। আর সাহাবায়ে কেরামরা কেউই রাশেদ খলিফা প্রদত্ত কোরানের বর্ণসংখ্যার হিসেব দেননি। এখন কোরানের বর্ণসংখ্যা নিয়ে কোন দাবিটি (রাশেদ খলিফার হিসেবকৃত বর্ণসংখ্যা ও হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের উল্লেখিত সাহাবায়ে কেরামের বর্ণসংখ্যা) সঠিক? বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া হল।

আবার হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রচিত *বয়ানুল কুরআন*-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ-এ কোরানের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২১২৫০ উল্লেখ করা হয়েছে। যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ্ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ*, পৃষ্ঠা ২১)।

আমাদের জানা মতে রাশেদ খলিফা যদিও কোরানের সর্বমোট শব্দসংখ্যার মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব দাবি করেননি, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিধায় কোরানের শব্দসংখ্যা ও বিভিন্ন অক্ষর সংখ্যা নিয়ে প্রখ্যাত ইসলামি বুজুর্গদের মতামত তুলে দেওয়া হল :

কোরানের শব্দ সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরামরা তাদের যুগে কোরানের শব্দসংখ্যাও নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত কোন রেওয়াত পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই পরবর্তীকালের। হুমায়দা আযরাজের গণনা অনুযায়ী কোরানের শব্দসংখ্যা ৭৬,৪৩০, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর গণনা মোতাবেক ৭০৪৩৯, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক ৭৬২৫০, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে ৮৬৪৩০। (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)। এখানের কোনটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য

নয়।

বয়ানুল কুরআন-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ-এ কোরানের সর্বমোট শব্দসংখ্যা ৮৬,৪৩০ উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ্ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ*, পৃষ্ঠা ২১)। যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম বলেন : কোরানের শব্দ সংখ্যা কত সে বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা-

১. ৭৭৯৩৪ (সাত্তাতর হাজার নয়শত চৌত্রিশটি)

২. ৭৭৪৩৭ (সাত্তাতর হাজার চারশত সাঁইত্রিশটি)

৩. ৭৭২৭৭ (সাত্তাতর হাজার দু'শত সাত্তাতরটি)

কোরানের হরফ সংখ্যাও এক কথায় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে শায়খ ইবনুদ দুয়ীস (র)-এর এক বর্ণনায় জানা যায়, কোরানের সর্বমোট হরফ সংখ্যা হচ্ছে ৩২৩৬৭১ (তিন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত একাত্তরটি)। (দ্রষ্টব্য : উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, দ্বিতীয় পত্র, পৃষ্ঠা ১৯)। উল্লেখিত সংখ্যার কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

কোরানে বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা

আরবি ভাষার ২৯টি বর্ণ দিয়ে কোরান রচিত। কোরানে এই ২৯টি অক্ষরের পরিসংখ্যান হাফেজ মুনির উদ্দীনের অনূদিত কোরান থেকে তুলে ধরা হল : আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা ১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল ৪৬৭৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৯৯১, শীন ২১১৫, ছোয়াদ ২০১২, দোয়াদ ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, যোয়া ৮৪২, আঈন ৯২২০, গাঈন ২২০৮, ফা ৮৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, নূন ৪০১৯০, ওয়াও ২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯। (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)। এখানে ২৯টি অক্ষরের মধ্যে কাফ ও লাম-এর সংখ্যা বাদে আর কোনটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

হজরত আশরাফ আলী থানভী'র *বয়ানুল কুরআন*-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদে কোরানের ২৯টি অক্ষরের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা নীচে তুলে ধরা হল :

আলিফ ৪৮৮৭১, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা ১২৭৬, জীম ৩২৭২, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬৪২, যাল ৪১৯৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৮৫১, শীন ৩২৫৩, সোয়াদ ২০১৩, দ্বোয়াদ ১৬০৭, ত্বোয়া ১২৭৪, যোয়া ৮৪২, আইন ১৪১০০, গাইন ২২০৮, ফা ৪৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫২৩, লাম ৩৪১২, মীম ২৬৫৩৫, নূন ২৬৫৬০, ওয়াও

২৬৫৩৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭২০, ইয়া ৩৫৯১৯। (দ্রষ্টব্য : ছহীহ্ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ, পৃষ্ঠা ২১)। এখানের কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

কোরানে 'আল্লাহ' শব্দটির সংখ্যা

দাবি : "কোরানে 'আল্লাহ' শব্দটি ২৬৯৮ বার উল্লেখিত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×১৪২=২৬৯৮)। এছাড়া 'আল্লাহ' উল্লেখ আছে এমন আয়াতগুলোর আয়াত নম্বর যোগ করলে যোগফল হয় ১১৮১২৩, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৬২১৭=১১৮১২৩)।"

আমরা জানি, রাশেদ খলিফা ৯ নম্বর সুরা তওবার শেষের দুটি আয়াত (১২৮ ও ১২৯) 'মিথ্যা' দাবি করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অথচ সুরা তওবার শেষ আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দটি রয়েছে। সুতরাং হিসাবটির কি অবস্থা দাঁড়ালো তা সহজেই অনুমেয়।

সুরা আলাক

দাবি : "প্রথম নাজেলকৃত সুরা আলাক-এর আয়াত সংখ্যা ১৯। কোরানের পেছন দিক থেকে গণনা করলে তার ক্রমিক নম্বর হয় ১৯। এছাড়া সুরাটির সর্বমোট আরবি বর্ণসংখ্যা ৩০৪ (১৯×১৬)। সুরাটির প্রথম পাঁচটি আয়াতে বর্ণসংখ্যা ৭৬ (১৯×৪) এবং শব্দ সংখ্যা ১৯টি।"

সুরা নাস ও সুরা ফালাক নিয়ে মতানৈক্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ইসলামি পণ্ডিতদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে, সে হিসেবে ৯৬ নম্বর সুরা আলাক কোরানের পেছনের দিক থেকে ১৯নং সুরা নাও হতে পারে। আবার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পেছনের দিক থেকে গণনা করতে হবে? কেন সামনের দিক থেকে নয়? মিলে যায় বলে? পেছনের দিকটি কি কোনো বিশেষ কারণে (রাশেদ খলিফার) বেশি প্রিয়? সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যা এবং প্রথম পাঁচটি আয়াতের বর্ণ সংখ্যা ও শব্দ সংখ্যা রাশেদ খলিফা ঠিক কিভাবে-কোন পদ্ধতিতে গণনা করেছেন, তা খুব পরিষ্কার নয়। রহস্যজনক ব্যাপার হচ্ছে সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যা, প্রথম পাঁচটি আয়াতের বর্ণসংখ্যা ও শব্দ সংখ্যাকে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য দাবি করলেও সবগুলো আয়াতের সর্বমোট শব্দ সংখ্যা ১৯ মিরাকলের বিবেচনায় আনেননি। কারণ এখানে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যতার দাবি করা যাচ্ছে না। আবার সুরা আলাকের আয়াত সংখ্যা ১৯টি ধরেছেন; অথচ এই সুরার প্রারম্ভের 'বিসমিল্লাহ'কে আয়াত হিসেবে ধরলে আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি।

সুরা নাসর

দাবি : "সুরা নাসর কোরানের সর্বশেষ নাজেলকৃত ওহি। সুরাটির প্রথম আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।"

এ বিষয়ে বেশ কিছু ভিন্নমত রয়েছে, যেমন :

১. সুরা নাসর কোরানের সর্বশেষ ওহি বলে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২. সুরাটি প্রথম আয়াতে আলিফের প্রতিনিধিত্বকারী খাড়া, যবর ও তাশদিদ রয়েছে যা বর্ণ গণনার সময় 'বিসমিল্লাহ'র মতো একই সমস্যার সৃষ্টি করে।

৩. সুরা নাসর যদি সর্বশেষ ওহি হয় তবে নিয়ম অনুযায়ী এই সুরার সর্বশেষ আয়াতটির বর্ণসংখ্যা বিবেচনায় নেওয়ার কথা। এছাড়া রাশেদ সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যাও বিবেচনায় আনতে পারতেন। কিন্তু কেন তা করেননি, তা বুঝতে বুদ্ধিমান পাঠকের কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

৪. কোরানের সর্বশেষ সংযুক্ত সুরা 'সুরা নাস'-এ ধরনের বিভাজ্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?

হরুফে মুকাত্তাত

রাশেদ খলিফা হরুফে মুকাত্তাত বা কিছু সুরার প্রারম্ভে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোকে নিয়ে পূর্বের মতই অলৌকিকতার জাল বুনেছেন। এক্ষেত্রেও ১৯ সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যতার প্রমাণের জন্য রীতিমতো মনগড়া হিসাবের আশ্রয় নিয়েছেন। অহেতুক লেখাটির কলেবর না বাড়িয়ে উৎসাহী পাঠকদের অনুরোধ করবো রাশেদ খলিফা হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কিত যে হিসেব দিয়েছেন, তা নিজেরাই একটু যাচাই করে দেখুন, এর অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই প্রতীয়মান হয়ে পড়বে। প্রথমেই একটি মজার বিষয় লক্ষ্য করবেন রাশেদ খলিফা ২৯টি সুরার প্রারম্ভে হরুফে মুকাত্তাত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ ২৯ সংখ্যাটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

হরুফে মুকাত্তাতযুক্ত ২৯টি সুরার বেশিরভাগই মাদানি সুরা, যাদের (হরুফে মুকাত্তাত) 'সুরার মূল অংশ' বলে ধরা হয় না। বলা হয়ে থাকে এগুলো যুক্ত হয়েছে সম্পাদনার সময়। 'অর্থহীন' হরুফে মুকাত্তাতগুলোর মাহাত্ম্য অজানা, অর্থ সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং 'অতীন্দ্রিয় ও অবাস্তব' দাবি করে অযথাই রহস্যের জাল তৈরি করা হয়েছে। মুসলিম মনীষীরা হরুফে মুকাত্তাতের ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। ইবনে সিনা, সুয়ুতি, ইবনে খালেদুন, আল-জামাখশারি, আল-বাদাবী প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে তাঁদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা সুয়ুতি বলেন : আল-কোরানের ১৯ নম্বর সুরা মরিয়মের প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সা'দ' অক্ষরগুলো আল্লাহর পাঁচটি গুণাবলীকে প্রকাশ করছে; যেমন কাফ্ (ك) অক্ষরটি করিম (সদয়), হা (ه) অক্ষরটি হাদী (পথপ্রদর্শক), ইয়া (ى) অক্ষরটি হাকিম (বিজ্ঞ), আইন (ع) অক্ষরটি আলিম (জ্ঞানী), এবং সোয়াদ (ص) অক্ষরটি সাদিক (ন্যায়নিষ্ঠ) বোঝাচ্ছে। তদ্রুপ ৭ নম্বর সুরা আল-আ'রাফ-এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত

'আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ' দ্বারা বোঝায় 'আনাল্লাহু রাহমানুস্ সামাদ' (আমি আল্লাহ, দয়ালু ও চিরঞ্জীব)। আল-বাদাবী একই ধরনের মত পোষণ করে বলেন : "১৩ নম্বর সুরা আর্ রা'দ-এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'আলিফ-লাম-মীম-রা' অক্ষর দ্বারা 'আনাল্লাহু আলিমু ওয়ারা' (আমি আল্লাহ সবজান্তা, সর্বদ্রষ্টা) বুঝিয়েছে। পাশাপাশি ইউরোপিয় কোরান-বিশ্লেষক যেমন এলয়স স্প্রেঙ্গার, থিওডোর নলডেক, হার্সফিল্ড, ওটো লথ, হ্যান্স বুয়ের প্রমুখ ব্যক্তিরাও কোরানের হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইউরোপিয় কোরান-বিশ্লেষকদের মধ্যে হার্সফিল্ড (Hartwig Hirschfeld) হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কে বলেন[৪১] : "সোয়াদ (ص) অক্ষরটি নবী মুহাম্মদ পত্নী হাফসার জন্য, নূন (ن) অক্ষরটি হজরত ওসমানের জন্য, মীম (م) অক্ষরটি আল মুগিরা, ত্বোয়া (ط) অক্ষরটি (হজরত আয়েশার ছোট বোনের স্বামী) তালহা ইত্যাদি। এরা সকলেই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন কোরান সংকলনের সাথে।" অর্থাৎ হার্সফিল্ডের মতানুসারে কোরান সংকলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা কোরানের বিভিন্ন সুরার প্রথমে নিজেদের নামকে সাংকেতিক চিহ্নরূপে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য : *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, page 155-156)।

আমরা রাশেদ খলিফার '১৯ মিরাকল'-এর কয়েকটি মূল দাবি সম্পর্কে জানতে পারলাম। এ ধরনের আরও বেশ কিছু দাবি তিনি উত্থাপন করেছেন যা শুধুই তাঁর কৌশলী ধূর্ততা প্রকাশ করে। রাশেদ খলিফার এ ধরনের দাবি সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়

রাশেদ খলিফা কোরানের সাথে সম্পর্কিত যেসব সংখ্যা কৌশলে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য বলে চালিয়ে দেওয়া যায় সেগুলোকেই শুধু বিবেচনায় এনেছেন। কিন্তু কোরানের সাথে সম্পর্কিত এমন অনেক কিছু আছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় অথচ হতে পারত। নীচে এরকম কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো :

১. কোরানের রুকু সংখ্যা ৫৪০টি, ৩০টি পারা, ৭টি মঞ্জিল রয়েছে, যার কোনোটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
২. কোরানের প্রতিটি সুরার আয়াত (যথা সুরা বাকারার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, সুরা আল-ই-ইমরানের আয়াত সংখ্যা ২০০ ইত্যাদি), শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হতে পারত।
৩. বলা হয় কোরান ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে। ২৩ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
৪. হজরত মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করেন। ৪০ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। আবার ৬২ (অন্য হিসেবে ৬৩) বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ

করেন। ৬২ বা ৬৩ সংখ্যাগুলির কোনটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

৫. কোরানের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হতে পারত।

৬. কোরানের যে আয়াতে ১৯ ম্যাজিকের কথা বলা হচ্ছে, তা হল ৭৪ নম্বর সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াত। ৭৪ এবং ৩০ সংখ্যাদ্বয় ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

৭. কোরানের প্রতিটি বর্ণের আলাদা আলাদা সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকতে পারত, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।

৮. কোরানের সুনির্দিষ্ট সুরা সংখ্যা, আয়াত সংখ্যা, শব্দ-বর্ণ সংখ্যা থাকতে পারত, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।

এরকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যা কোরান বা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।[৪২] ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্যতা যদি কোরানের অলৌকিকতার প্রমাণ হতে পারে তবে ১৯ দ্বারা অবিভাজ্যতা লৌকিকতার প্রমাণ হবে না কেন?

নিঃশেষে বিভাজ্যতা

আমাদের প্রয়োজনের কারণেই কখনো কখনো নিঃশেষে বিভাজ্যতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি; ধরা যাক, ১০টি আম আছে এবং সংখ্যায় মোট পাঁচ জন ব্যক্তি রয়েছেন। তাহলে সহজেই সবার মধ্যে সমান ভাগে আম ভাগ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আম যদি ১১টি হয়, তবে পাঁচ জনের কাছে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া কিছুটা জটিল হয়ে পড়বে; অর্থাৎ নিঃশেষে বিভাজ্যতা হলে আমরা অনেক সময় খুব সহজেই চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। আবার অনেক সময় নিঃশেষে বিভাজ্যতার কোনো প্রয়োজন হয় না, যেমন পানীয়ের ক্ষেত্রে। পানীয়কে আমরা ইচ্ছেমত সমানভাগে ভাগ করতে পারি। আরেকটি কথা ক্রমিক যে কোনো ১৯টি সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। তাই নিঃশেষে বিভাজ্যতার সাথে অলৌকিকতার যে কোনো সম্পর্ক নেই তা বুঝতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই।

নিঃশেষে বিভাজ্যতাকে যদি কেউ অলৌকিক বলে দাবি করেন তবে অবিভাজ্যতাকে কেন অলৌকিক বলা যাবে না? যেমন কেউ বললো, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের (অধ্যায় সংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা, বাক্য সংখ্যা, বর্ণ সংখ্যা ইত্যাদি) কোনো কিছুই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়, তাই গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ একটি 'অলৌকিক কাব্যগ্রন্থ'। তখন অলৌকিক-অন্বেষণকারীরা কি জবাব দিবেন?

কেন ১৯?

কোরানে ৭ আসমানের কথা আছে, ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি কিন্তু রাশেদ খলিফা কোরানে এত সংখ্যা থাকতে কেন ১৯ সংখ্যাটিকে বেছে নিলেন তার একটি জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন, যদিও তা মোটেও সন্তোষজনক নয়। যেসব কারণ তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তার বেশ কতকগুলো পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। রাশেদ খলিফা প্রদত্ত আরো কয়েকটি কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক[৪৩] :

১। ১৯ একটি মৌলিক সংখ্যা।

> মৌলিক সংখ্যা তো প্রচুর আছে, যেমন ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ২৩ ... ইত্যাদি। আর কোরানেও তো ১৯ ছাড়া আরো কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন ৭।

২। ১ ও ৯ অঙ্কদ্বয় পৃথিবীর সব ভাষায় একই রকম। অর্থাৎ ১ ও ৯-এর লিখিতরূপ পৃথিবীর সব ভাষায় একই।

> অলৌকিকতা অন্বেষণের এ ধরনের অসিলা একমাত্র মূর্খতা আর নির্বুদ্ধিতার মহামিলনের ফলেই সম্ভব।

৩। ১০ + ৯ = ১৯

$১০^2 - ৯^2 = ১৯$

> এটি যে কোনো পর্যায়ক্রমিক দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন :

৩ + ২ = ৫

$৩^2 - ২^2 = ৫$

৫ + ৪ = ৯

$৫^2 - ৪^2 = ৯$

১৩ + ১২ = ২৫

$১৩^2 - ১২^2 = ২৫$

এটিকে কারণ হিসেবে ধরলে, রাশেদ খলিফার 'কৌশলী মানসিকতা' আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

৪। আমরা যেসব অঙ্ক গাণিতিক কাজে ব্যবহার করি, তার প্রথম সংখ্যা ১ এবং শেষ সংখ্যা ৯।

> গাণিতিক হিসাব-নিকাশে আমরা সাধারণত দশমিক পদ্ধতি বা দশভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার

করি। মানব-ইতিহাসে সংখ্যার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে দশভিত্তিক সংখ্যা গণনা সুবিধাজনক হওয়ায় (কেউ কেউ বলেন আমাদের হাতে দশটি আঙুল থাকায়) এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন অনুসরণ করে আসছি; যেমন আমরা গণনার সময় ৯ এর পরই ১০ চলে যাই কিন্তু এর মধ্যে আরো কিছু সংখ্যা থাকতে পারতো অথবা কিছু সংখ্যা কম হতে পারতো। তাই দশমিক পদ্ধতির গণনায় (০ বাদ দেওয়ায়) প্রথম সংখ্যা ১ এবং শেষ সংখ্যা ৯ হওয়ার সুবাদে এখানে কী অলৌকিকত্ব পাওয়া গেল তা বোধগম্য নয়?

বর্তমানে শুধু দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাও নয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে আরো কিছু সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন :

বাইনারি পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সংখ্যা হচ্ছে দুটি ০ ও ১। কম্পিউটারের যাবতীয় সব প্রোগাম এই বাইনারি মেথডে লেখা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি ১৯ লেখা হয় ১০০১১।

অকটেট পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যেসব অঙ্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার প্রথমটি ০ ও শেষটি ৭। আর এ পদ্ধতিতে ১৯ লেখা হয় ২৩।

হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যেসব অঙ্ক ব্যবহৃত হয় তার প্রথমটি ০ ও শেষটি F। এ পদ্ধতিতে ১৯কে লেখা হয় ১৩।

তাই শুধুমাত্র ডেসিমেল বা দশমিক পদ্ধতিকে বিবেচনায় এনে ১৯-এর মধ্যে অলৌকিকত্ব খোঁজাকে 'উদ্দেশ্যমূলক' বলে ধরে নিতে হবে।

১৯ একটি ছোট সংখ্যা। ভালো করে খোঁজলে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য অনেক কিছুরই (যেমন কারো জন্ম সাল, মৃত্যু সাল, জীবনের স্মরণীয় ঘটনার তারিখ, মাসিক আয়-ব্যয়, কিংবা কোনো বইয়ের পৃষ্ঠা, অধ্যায়, শব্দ ইত্যাদি) সংখ্যা পাওয়া যাবে। শুধু ১৯ কেন, এরকম যে কোনো ছোট সংখ্যা দ্বারা একই ধরনের অলৌকিকতার দাবি উত্থাপন করা সম্ভব।

সম্ভাবনা ও অলৌকিকতা

রাশেদ খলিফা কোরানের সাথে সম্পর্কিত কিছু সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বলে দাবি করে একেই কোরানের অলৌকিকতার পক্ষে প্রমাণ বলে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। '১৯ মিরাকল' বিষয়টি যদি সত্যি সত্যি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ যেমন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি যে কোনোটির বেলায় ঘটত তবে কেউ কি ঐ গ্রন্থকে অলৌকিক বলে মেনে নেবেন? যদিও অনেক গ্রন্থে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে তবে কেউ তা গণনা করার চেষ্টা করবে না; কারণ এর মধ্যে অলৌকিকতা (মূলত

সংখ্যা তত্ত্বের চমৎকার ব্যবহার) খুঁজে বের করলেও তা বাজারে চলবে না, ধর্মব্যবসাও হবে না।

সম্ভাবনা বিষয়ে একটি কথা বলা প্রয়োজন। একজন লেখকের লেখা কোনো একটি গ্রন্থ (নকল করা ছাড়া) হুবুহু আরেকজন লেখকের পক্ষে কাকতালীয়ভাবে লিখে ফেলা একদম অসম্ভব। শরৎ চন্দ্রের 'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখবেন না, এটাই স্বাভাবিক এবং এর অন্যথা অসম্ভব। এ জন্য এই গ্রন্থগুলি অলৌকিক হয়ে যায়নি। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি কোনো কিছুর অসম্ভাব্যতা এর অলৌকিকতার প্রমাণ হতে পারে না।

রাশেদ খলিফার দাবি যদি সত্যি হত

রাশেদ খলিফার দাবি মত যদি কোরান সত্যিই ১৯ সংখ্যা দ্বারা আবদ্ধ থাকতো তবুও এ সম্পর্কে দুটি কথা বলার অবকাশ থাকতো :

১। এটি সম্পূর্ণ কাকতালীয় (Coincidence)। এ রকম অনেক ঘটনা বাস্তবে ঘটে থাকে, যেমন ফিবোনাক্কি রাশিমালা। এ ধরনের ঘটনা যদি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ বা অন্য বিষয়ে পাওয়া যায় তবে তা অলৌকিক বলে দাবি করা হয় না। তাছাড়া মৌলিক যে প্রশ্নটি উত্থাপিত করা যায় : কোনো গ্রন্থের বা কোনো বিষয়ের রচনাশৈলী (Style) কি ঐ বিষয়বস্তুর বৈধতা দিতে পারে? স্টাইল হচ্ছে কেমন করে-কিভাবে একটি বিষয়কে উপস্থাপন করা হবে, আর বিষয়বস্তু হচ্ছে কী উপস্থাপন করা হবে। উত্তরটা হচ্ছে না, স্টাইল বিষয়বস্তুর বৈধতা বা Validity দিতে পারে না; কারণ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন করা সম্ভব আর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু একই স্টাইলে বা রচনাশৈলী দ্বারা উপস্থাপন করা সম্ভব। স্টাইল ও বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তসম্পর্ক নেই। স্টাইল বা রচনাশৈলী বলতে বুঝি : কোন ভাষায় এটি উপস্থাপন করা হচ্ছে, গদ্যে না পদ্যে, এটি মৌখিক না লিখিত, হস্তলিখিত না প্রিন্ট করা, লেখার অক্ষর কত বড়, বাক্য কত বড়, অক্ষরের সংখ্যা কতটি, শব্দ-প্যারাগ্রাফ-লাইন কতটি, বিষয়টি কি শ্রুতিমধুর, সুন্দর, শব্দগুলো-বাক্যগুলোর মধ্যে অন্তমিল কিরকম, বাচনভঙ্গি কিরকম ইত্যাদি।[৪৪] রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, কোরানসহ যে কোনো ধর্মগ্রন্থকেই তার রচনাশৈলী দ্বারা অলৌকিক দাবি করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২। এটি পূর্বপরিকল্পিত; যেমন আমেরিকান লেখক Ernest Vincent Wright-এর লেখা Gadsby: Champion of Youth উপন্যাসটি বা ইভান পেনিনের আবিষ্কার ওল্ডটেস্টামেন্টের অলৌকিক ৭ সংখ্যা। যেহেতু বাইবেলে বলা হয়েছে অনেক লেখক এই গ্রন্থ

রচনা করেছেন, তাই পূর্বপরিকল্পিতভাবে ৭ সংখ্যাটি সময়ে সময়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'কোরান'-এর অলৌকিকত্বে সংশয়পোষণকারীরা বলেন : "হজরত মুহাম্মদ উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন না। বোখারির প্রচুর সহি হাদিস রয়েছে যা নবী মুহাম্মদকে লেখাপড়া জানা মানুষ হিসেবেই উপস্থাপন করে; যেমন সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৮৮; সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ৬৫; সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ১১৪। ঐ সময়ে (ষষ্ঠ শতাব্দী) আরবের কাব্য-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ চলছিল। বর্ণসংখ্যা ও বাক্যসংখ্যার সুনির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে অগণিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'চতুর্দশপদী কবিতা' (সনেট)। অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ এবং তাঁর সহযোগীরা ১৯ সংখ্যার বিষয়টি মাথায় রেখেই কোরান রচনা করেছিলেন।"

কোরান সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্যের জবাব রাশেদ খলিফার '১৯ মিরাকল' থেকে দেওয়া যায় না। কোরানকে অলৌকিক প্রমাণের 'রাশেদ খলিফার সংখ্যাভিত্তিক' কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

উপসংহার

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম :

১) উনিশ নিয়ে কোরানের অলৌকিকত্ব প্রমাণের রাশেদ খলিফার দাবি অন্তঃসারশূন্য।

২) কোরানের সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে শুধুমাত্র দোজখের ফেরেশতাদের সংখ্যা বলা হয়েছে; কোনো অলৌকিক সংখ্যা (যেমনটা রাশেদ খলিফা দাবি করেছেন) বা অন্য কিছু বলা হয়নি।

৩) রাশেদ খলিফা কোরান শরিফে 'অলৌকিকত্বের উপস্থিতি' প্রমাণের জন্য কোরানের আয়াতে যেমন পরিবর্তন করেছেন, তেমনি আয়াত কেটে কমিয়ে দিয়েছেন, ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৪) এই ধরনের কথিত 'মিরাকল' ধর্মগ্রন্থ কোরান ছাড়াও আরো অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে।

৫) (ইসলামি ভাষ্য মতেই) সম্পূর্ণ কোরান যেহেতু লিখিতরূপে নাজেল হয়নি, তাই এর লিখিতরূপের মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজে পাওয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অপ্রাসঙ্গিকও বটে। একটি ভাষার লিখিতরূপ ভাষা বিশেষজ্ঞরা সময়ে-সময়ে গণমানুষের প্রয়োজনে নির্ধারণ করে থাকেন। পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংযোজন-বিয়োজন ঘটান। অর্থাৎ ভাষার লিখিতরূপ সম্পূর্ণ লৌকিক।

'মিরাকল' টাইটেল জুড়ে দিয়ে কোটি মানুষের দুর্বল আবেগ-অনুভূতির কেন্দ্র 'ধর্মগ্রন্থ' নিয়ে অসাধু ব্যবসার চমৎকার উদাহরণ রাশেদ খলিফার এই '১৯ মিরাকল'। যুগে যুগে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে ধর্মব্যবসায়ী এ ধরনের হুজুগ সৃষ্টি করে এসেছে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার তাগিদ থেকে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু অবাক হতে হয় উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পর্যন্ত যখন নিজেদের দীর্ঘদিনের অর্জিত কাণ্ডজ্ঞান-যুক্তিবোধ-শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু রহিত করে গা ভাসিয়ে দেন হুজুগের তালে।

উৎস নির্দেশ

১) David Hume, *An Inquiry Concerning Human Understanding,* Section X "Of Miracles," (1748), Bobbs-Merrill, Library of Liberal Arts edition. http://18th.eserver.org/hume-enquiry.html#10

২) http://www.newstatesman.com/Life/200606050009

৩) আরও দেখুন : Ali Sina, *The Miracles of Allah*, http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/miracles_of_allah.htm

৪) The Skeptic's Dictionary, *pareidolia*, http://www.skepdic.com/pareidol.html

৫) http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=487764&in_page_id=1811

৬) Ernest Vincent Wright-এর উপন্যাসটি পাশের ওয়েব সাইট থেকে পাঠ করা যাবে : http://www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html

৭) অনন্ত বিজয়, *'ফিবোনাক্কির গণিত রহস্য'*, *সাপ্তাহিক দিবালোক*, ঈদসংখ্যা, ৮ ডিসেম্বর (রোববার), ২০০৮, বিয়ানীবাজার, সিলেট, পৃষ্ঠা ৩।

৮) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৭৬-১৯১।

৯) Uri geller, *The 11:11 phenomenon*, http://www.uri-geller.com/articles/11.htm

১০) The Skeptic's Dictionary, *law of truly large numbers (coincidence)*, http://skepdic.com/lawofnumbers.html

১১) Keith Newman, *Is God A Mathematician?*, http://www.wordworx.co.nz/panin.html

১২) G. Nehls, *The Mysterious 19 in the Quran: A Critical Evaluation*, http://www.answering-islam.org/Nehls/Ask/number19.html

১৩) http://www.greaterthings.com/Word-Number/CenterofBible/Psalm118.htm

১৪) Rashad Khalifa : Biography; http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa

১৫) http://www.submission.org/salat-how.html

১৬) http://www.submission.org/suras/sura25.html

১৭) http://www.submission.org/suras/sura36.html

১৮) http://www.submission.org/suras/sura42.html

১৯) http://www.submission.org/suras/sura81.html

২০) http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/

২১) http://www.submission.org/quran/app1.html

২২) Martin Gardner, The numerology of Dr. Rashad Khalifa-Scientist, Skeptical Inquirer, Sept-Oct, 1997.

২৩) Submission.org, *Tampering With the Word of God*, Appendix 24, http://www.submission.org/tampering.html. And *Preserving and protecting the*

Quran, http://www.submission.org/quran/protect.html.

২৪) কাজী জাহান মিয়া, *আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ* (মহাকাশ পর্ব-১), প্রকাশক: নাহরীন পারভীন, রায়ের বাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ- অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭-২৯।

২৫) ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, *কমপিউটার ও আল কুরআন*, প্রকাশনায় : ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, মিরপুর, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৩।

২৬) হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ২০০২।

২৭) হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) (মূল উর্দু), *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ* (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯৪২।

২৮) এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, *বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ*, প্রকাশক: এ, কে,এম, শহিদুল হক, কুমিল্লা, অনুবাদ কাল ১৯৬২-৬৫, পৃষ্ঠা ৪৮০।

২৯) হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, *পবিত্র কোরআনুল করীম* (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃষ্ঠা ১৪১৯, ১৪২১।

৩০) অধ্যক্ষ নাসিম উদ্দিন আহমদ, *পবিত্র কোরআন* (পাদটীকাসহ বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ), রংপুর পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩০০।

৩১) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, (অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম), ১৮শ খণ্ড, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা ১০৭, ১০৯।

৩২) *আল-কুরআনুল করীম*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল : অক্টোবর, ১৯৯৪ (অষ্টম মুদ্রণ), পৃষ্ঠা ৯৬৮।

৩৩) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, অনুবাদ : হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ২১ তম খণ্ড, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৪।

৩৪) সা'দ উল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ১৯৪।

৩৫) http://www.submission.org/false-verses.html

৩৬) http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/

৩৭) http://www.submission.org/suras/sura9.html

৩৮) এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম, *উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা*, দ্বিতীয় পত্র, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৫, পৃষ্ঠা নম্বর ১৮-১৯।

৩৯) Benjamin Walker, *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, Rupa & Co, New Delhi, 2004, Page 158-159.

৪০) William Campbell, *A Numeric Miracle of the Number 19?*, http://answering-islam.org.uk/Campbell/s6c1.html

৪১) Aurthur Jeffery, *The Mystic Letters of the Koran*, http://www.answering-islam.org/Books/Jeffery/mystic_letters.htm.

৪২) Mumin Salih, *New Amazing Numerical Findings in the Quran*, http://www.news.faithfreedom.org/index.php?name=News&file=article&sid=1836.

৪৩) http://www.submission.org/quran/app1-part2.html

৪৪) Hekmat, *The Miracle of 19*, http://www.faithfreedom.org/Articles/Hikmat10101.htm

ভগবদ্‌গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য

দিন কয়েক আগে হঠাৎ করে একটি পত্রিকা হাতে আসে; পত্রিকাটি দেখে প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইলেও প্রথম পাতার মধ্যখানে ঢাউস আকারে ছাপানো একটি খবরে অজানা কারণে চোখ আটকে যায়। তাই এবার আর এড়িয়ে না গিয়ে পড়তে বসলাম। খবরটি পড়ার পর আমার অনুভূতি হয়েছিল মারাত্মক। পাঠকদের অবগতির জন্য শুধু ঐ খবরটি নীচে তুলে দেয়া হল:

জটিল সমস্যা নিরসন করে শ্রীমদ্ভগবদগীতা
আলবার্ট আইনস্টাইন

আলবার্ট আইনস্টাইন কালজয়ী এক নাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। বিজ্ঞান জগতে অনেক বিজ্ঞানীর অবদান সময়ের আবর্তে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে হয়তো ধরে রাখতে পারে না তার বিস্ময়। হয়ে পড়ে কিছুটা ম্লান। কিন্তু বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন এর অবদান স্বর্গেও পারিজাত সদৃশ। আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ $E = mc^2$ এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার এই পৃথিবী গ্রহে নয়; এমনকি ভিন্ন গ্রহে যদি কোন মানুষ বাস করে সেখানেও সৃষ্টি করবে একই বিস্ময়, একই কৌতূহল।

এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার হল আইনস্টাইন ইহুদি বংশোদ্ভূত হয়েও নিয়মিত শ্রী শ্রী গীতা চর্চা করতেন। আরও বিস্ময় এবং মজার ব্যাপার হল যে নিয়মিত গীতা পাঠ এবং গীতা ধ্যানের ফসলই হল আইনস্টাইনের উক্ত দুটি যুগান্তরকারী আবিষ্কার।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের শেষ প্রহর। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল ভারতবর্ষে তাদের রাজত্বের মেয়াদ শেষ। তাদেরকে সবকিছু গুটিয়ে অচিরেই ভারত ছেড়ে যেতে হবে। তারা চিন্তা করল যদি ভারত ছাড়তে হয়, তবে ভারত থেকে এমন এক অমূল্য সম্পদ তারা নিয়ে যাবে, যার আবেদন বিশ্বজনীন এবং কালজয়ী। বলা বাহুল্য এই কালজয়ী অমূল্য সম্পদ আর কিছুই নয়, তা হল ইংরেজিতে অনুবাদ করা শ্রী শ্রী গীতা। শ্রীমদ্ভগবদগীতার অনুবাদে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা নেন চার্লস উইলকিনস, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি হিসাবে এদেশে আসেন। উইলকিনস-এর প্রশংসনীয় উদ্যোগের সহায়তা করেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। এখন যদিও প্রায় পঞ্চাশোর্ধ বিদেশি ভাষায় গীতার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। Theory of Relativity লিখে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইনস্টাইন তখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রধান। ভারতের

কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আপেক্ষিকতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে যান। বলা বাহুল্য, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পর পৃথিবীতে মাত্র গুটিকয়েক পদার্থবিজ্ঞানী তাহা বুঝতে পেরেছিলেন। আইনস্টাইন আসলেন এবং সকলকে বিস্ময়াভূত করে সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন—

কিংতে নাম? (তোমাদের নাম কি?)

কথম আগসি? (কোথা হতে এসেছ?)

সাক্ষাতপ্রার্থী ভারতীয় অধ্যাপকবৃন্দের চক্ষুস্থির, হতবিহ্বল চিত্তে তারা উত্তর দিল :

We don't know how to speak in Sanskrit. (আমরা সংস্কৃতে কথা বলতে জানি না।) Please speak with us in English. (অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলুন।)

আইনস্টাইন ঝড়ের বেগে ক্ষীপ্ত হয়ে বললেন, What! You say you are Indians. But you can not speak in Sanskrit. (কি! তোমরা বলছ তোমরা ভারতীয়, কিন্তু সংস্কৃত জান না।)

উত্তরে ভারতীয়রা বলল, Sanskrit is a dead language in our country. It is used only in ancestral Functions. (সংস্কৃত হল আমাদের দেশের একটি প্রাণহীন ভাষা। কেবল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ইহা ব্যবহার করা হয়।) আইনস্টাইন তেলে-বেগুনে জ্বলে রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন এবং বললেন, Who says Sanskrit is the dead language? It is the sole living language in the world. (কে বলে সংস্কৃত প্রাণহীন ভাষা? পৃথিবীতে একমাত্র জীবন্ত ভাষা হল সংস্কৃত।)

তারপর আইনস্টাইনের বক্তব্য নিম্নরূপ :

"আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করা গীতা পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যাই, আত্মস্থ হয়ে পড়ি এবং এই আত্মস্থ অবস্থায় পদার্থবিজ্ঞানের অতি দুর্বোধ্য আপেক্ষিক তত্ত্ব আমার কাছে সূর্যের আলোর মত সহজ সরল হয়ে যায়, সকল জটিল তত্ত্ব হয়ে যায় সরল।"

আইনস্টাইন আরও বলেন : "আমি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাই না। সংস্কৃত অক্ষরে লেখা মূলগ্রন্থ পাঠের জন্য আমি নিজে সংস্কৃত বর্ণমালা, সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ব করি। আমার উপলব্ধি হল, "অমৃতং মধুররং সম্যক, সংস্কৃতং হি ততোধিকম॥" যতদিন বিন্ধ্যহিমাচল পর্বত থাকবে দণ্ডায়মান, যতদিন গঙ্গা, কাবেরী,

গোদাবরী রবে বহমান ততদিন সংস্কৃত থাকবে দীপ্তিমান।" ভারতীয় পদার্থবিদরা লজ্জায় মাথা নত করে রইল। অনুধাবন করতে পারল ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা এবং গীতা গ্রন্থ কত প্রভাবশালী এবং সমৃদ্ধ।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'হরেকৃষ্ণ সমাচার' (১৪ বর্ষ॥ ৭ম সংখ্যা॥ এপ্রিল ২০০৬ ইং॥ চৈত্র ১৪১২ বৈশাখ ১৪১৩॥) পত্রিকার খবর এটি। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ-ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর মুখপত্র। মাসিক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নাম উল্লেখ আছে আচার্যঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। আর বর্তমান সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে লিখিত আছে শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী।

লেখাটি পাঠে কয়েকটি প্রশ্ন তৎক্ষণাৎ মাথায় উদয় হয় : (১) এই লেখায় কোনো লেখকের নাম উল্লেখ নেই কেন? যদিও পত্রিকার অন্যান্য সব লেখায় লেখকের নাম উল্লেখ আছে। (২) এই লেখার কোনো তথ্যসূত্র বা উৎস উল্লেখ নেই কেন? কিংবা কোথা হতে লেখক এই ধরনের (অবিশ্বাস্য) তথ্য পেলেন? (৩) যে কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন খবরে প্রকাশ, তাঁদের নামও লেখায় উল্লেখ নেই, কেন? (৪) কবে ঐ বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন? (৫) লেখক কী কৌশলে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সূত্র, ভারতীয়রা গীতা'র চর্চা করে বলে বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ লেখকের বক্তব্য মতে ভারতীয় পদার্থবিদরা সংস্কৃত ভাষা জানতেন না, এটা তো স্ববিরোধী হয়ে যায়? (৬) শ্রীমদ্ভগবদগীতা'কে লেখক কি বিজ্ঞানের কোনো বই (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইত্যাদি) হিসেবে ভাবছেন, না-কী একে তিনি শুধুই একটি 'ধর্মগ্রন্থ' (যেমন : তোরাহ, কোরান, বাইবেল, ত্রিপিটক) বলে ভাবছেন? না-কী ভাবছেন এই দুটির সন্নিবেশ বলে?

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিজ্ঞান অস্বাভাবিক গতিতে অপ্রতিরুদ্ধ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার আমাদের আটপৌরে জীবনটাকে এমন নাড়া দিয়েছে যে এখন এক মুহূর্ত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের চলে না। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির তুলনায় ধর্মের বাণীগুলো কেমন যেন বোকা-বোকা ধরনের কথাবার্তা বলেই মনে হয়। চারিদিকে ইসলামি মৌলবাদের ডামাডোলের ফাঁক দিয়ে হিন্দুদের মধ্যেও বিজ্ঞান-বিরোধী অপতৎরতা বিস্তৃত হচ্ছে, সামান্য পরিসরে এখানে তুলে ধরা হল।

জানা মতে, আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইসকন' (International Society for Krishna Consciousness, ISKCON) দশক কাল ধরে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় বাণী প্রচারের নামে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অপবৈজ্ঞানিক জ্ঞানও প্রচার করছে। ইসকন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই আমরা পাঠ করেছি। বইগুলো পাঠে চক্ষু চড়াকগাছ! আজকের যুগে বিজ্ঞানের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেও আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের যে অকথ্য-অশ্লীল

ভাষায় গালাগালি করা সম্ভব তা ইসকনের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি পাঠের আগে জানা ছিল না।

কয়েকটি উদাহরণ দেই। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭) ও তাঁর শিষ্যদের ভাষায়, আধুনিক বিজ্ঞানের দর্শন হচ্ছে 'কূপমণ্ডূক দর্শন', বিজ্ঞানীরা মহামূর্খ, নির্বোধ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করা কতগুলি কুয়োর ব্যাঙ, বিকৃত মস্তিষ্কধারী, কুকুর, শূকর, উট, গাধার থেকে কোনো অংশে উন্নত নয়। বিজ্ঞানীরা বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাচ্ছে। স্বামী প্রভুপাদ এবং শিষ্যদের অভিযোগ আধুনিক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা কেন ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না? কেন ভগবানকে নিয়ে গবেষণা করেন না, আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেন না, বেদ-গীতার বক্তব্যে আস্থা রাখেন না, বেদ-গীতাসহ অন্যান্য হিন্দুধর্মীয় পুস্তককে কেন বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন না?

আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সম্পর্কে ইসকনের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রদত্ত বক্তব্যে যদি কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় হয়, তবে একটু কষ্ট করে ইসকনের ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত *জীবন আসে জীবন থেকে*, *কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান* গ্রন্থ দুটি পাঠ করুন। গ্রন্থ দুটির পাতায় পাতায় একদিকে যেমন বিজ্ঞানের তীব্র বিরোধিতা, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন তত্ত্বের অপব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে আবার নিজেদের ধর্মগ্রন্থের বিজ্ঞানের স্বীকৃতি পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষণীয়। কোথাও স্ববিরোধী বক্তব্য আবার কোথাওবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাব। আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে গুটিকয়েক উদাহরণ দেয়া হল :

জীবন আসে জীবন থেকে গ্রন্থের ১৪-১৫ পৃষ্ঠায় বিশ্বের সবচেয়ে দামি এবং মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে 'গর্দভের নোবেল পুরস্কার'। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীরা বিকৃত মস্তিষ্কধারী, কুকুর, শূকর, গাধা আর নোবেল কমিটির সদস্যরা পশুর থেকে উন্নত নয়, এক নম্বরের মূর্খ। প্রভুপাদ 'নোবেল পুরস্কার' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এভাবে, "একটি পশু আর একটি পশুর স্তব করছে, এতে কি কৃতিত্ব রয়েছে?..."

কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থেও (পৃষ্ঠা ৫৬-৫৯) নোবেল পুরস্কার নিয়ে একই বক্তব্য রয়েছে : 'মূর্খদের জন্য নোবেল পুরস্কার।' অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে (নোবেল পুরস্কার নিয়ে এতো কুৎসিৎ গালাগালির পরেও) শ্রীল প্রভুপাদ এবং অনুসারীরা জোর দাবি জানিয়েছেন, 'ভগবানকে নোবেল পুরস্কার দিন' এমন কী ইসকন গুরু শ্রীল প্রভুপাদকে নোবেল দেয়ার দাবি তুলেছেন। (দ্রষ্টব্য : *কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান*, পৃষ্ঠা ১৮৭, ১৮৯)।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন : "সমস্ত জড় বস্তুই হচ্ছে পাঁচটি স্থূল পদার্থ (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) এবং তিনটি সূক্ষ্ম পদার্থ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার)-এর সমন্বয়"।

শিষ্য করন্ধর বলেন : "বৈদিক জ্ঞান অনুসারে জড়শক্তির প্রথম প্রকাশ হচ্ছে অহংকার। তারপরে তা বুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়, তারপরে মনে এবং তারপর আকাশ, বায়ু, আগুন, জল এবং মাটি এই স্থূল উপাদানগুলিতে রূপান্তরিত হয়। এই সবকটি মৌলিক উপাদান দিয়েই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে...।" (দ্রষ্টব্য : *জীবন আসে জীবন থেকে*, পৃষ্ঠা ৪)।

বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করা ভালো। বিশ্বপ্রকৃতির গঠন-কাঠামো জানতে আমাদের পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়। অধাত্মবাদী বা ভাববাদীদের ব্যবহৃত ভাষা-পরিভাষা থেকে কোনো বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণী জ্ঞানও আহরিত হয় না। গোঁজামিল আর ধোঁয়াসার সৃষ্টি হয়। তাই এ আলোচনায় বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। বিজ্ঞানের আলোতেই দেখি ইসকনের বৈদিক জ্ঞানের রূপ।

মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞা কী? কিংবা যৌগিক পদার্থ কাকে বলে? যারা জানেন না, কোনগুলো মৌলিক পদার্থ, কোনগুলো যৌগিক পদার্থ, বস্তু এবং শক্তির গঠন-ধর্ম নিয়ে যাদের মধ্যে নবম-দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের জ্ঞানের অভাব দেখা যায়, তাঁরাই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীদের সবক দিচ্ছেন। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায় :

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা"!

মন, অহংকার আর বুদ্ধি জীবের মস্তিষ্কের স্নায়ুর ক্রিয়ার ফল। মন, অহংকার, বুদ্ধি স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নয়। মানুষ ছাড়াও স্তন্যপায়ী অনেক উচ্চশ্রেণীর প্রাণীতে বিভিন্ন ধরনের আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা অংনেকাংশে লক্ষ্য করা যায়।

পৃথিবীর 'আকাশ' কোনো পদার্থ নয়। আমাদের এক ধরনের দৃষ্টির প্রান্তসীমা বলা যেতে পারে। সূর্যের আলোর সাতটি রঙ রয়েছে। যথা : বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন আমরা, সূর্যের আলো আমাদের চোখে পৌঁছুবার আগে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় ধুলিকণা বা অণুর সাথে ক্রিয়া করে থাকে। বাতাসের (ধুলিকণা, গ্যাসীয় অণু) ঘনত্বের স্তর বা প্রকারভেদের কারণে আকাশের বিভিন্ন রঙ দেখা যায়। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে অনেকাংশ নীল দেখায় কারণ, নীল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি বাকি রঙ (যেমন লাল রঙ) থেকে। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় আকাশের রঙ লাল বা কমলা দেখায় কারণ এ সময় আমাদের দৃষ্টিরেখা থেকে নীল রঙ বিক্ষিপ্তভাবে দূরে ছড়িয়ে থাকে। যেহেতু চাঁদের কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। তাই চাঁদের আকাশ অন্ধকার। অর্থাৎ সৌরজগতের যেসব গ্রহ-উপগ্রহের বায়ুমণ্ডল রয়েছে তাদের আকাশ বর্ণিল আর যাদের বায়ুমণ্ডল নেই তাদের আকাশ অন্ধকার। জল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণ। এটি মৌলিক পদার্থ নয়। আগুন হলো শক্তি, বস্তু নয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসকন ত্রৈমাসিক-মাসিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বই-পুস্তক, ধর্মীয় ছবি-পোস্টার, লিফলেট, পূজার বিভিন্ন উপকরণ, প্রসাদ ইত্যাদি হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করে থাকে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিখ্যাত *রাশিয়ার চিঠি* গ্রন্থে (৭নং চিঠির কিছু উক্তির মধ্যে) বলেছেন : "এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার

সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মত : আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।"

এই 'আরামের মার' দেওয়ার জন্য শুধু ইসকনই নয়, এ দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, অনুকূল আশ্রম, লোকনাথ আশ্রম ইত্যাদি নামের আশ্রম, কিংবা সাধক পুরুষ, মহাপুরুষ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলছেন।

গীতার অতীত

আমাদের এ নিবন্ধটির মূল বিষয় গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ। আলোচনাকে বোধগম্য করে তোলার জন্য গীতার অতীত ইতিহাসসহ আরো কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হবে এ প্রবন্ধে। হিন্দুদের কাছে গীতা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সর্বজ্ঞানের আকর গ্রন্থ, বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।

বাংলা ভাষায় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন রামায়ণ, মহাভারতসহ ভগবদ্‌গীতা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের আলোকে অত্যন্ত গবেষণাধর্মী দুটি গ্রন্থ (*মহাকাব্য ও মৌলবাদ*, *সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা*) রচনা করেছেন ভারতীয় বিদগ্ধ লেখক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামায়ন, মহাভারত সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বেশকিছু বিশ্লেষণী গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত হলেও শুধুমাত্র গীতাকে নিয়ে জয়ন্তানুজের রচিত গ্রন্থের মত এমন বিশ্লেষণধর্মী ও মননশীল গ্রন্থ আমাদের নজরে আসেনি। তাই গীতার অতীত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমাদের মূল উপজীব্য জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ দুটি। গীতা কিংবা রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে আরো বিস্তৃত জ্ঞান লাভের জন্য উক্ত গ্রন্থ দুটি পাঠ একান্ত আবশ্যিক।

প্রায় হিন্দু বাড়িতে শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পবিত্রভাবে আলাদা করে তুলে রাখা হয়। যেমনটি কোরান, বাইবেলকে যত্নে রাখেন ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। অনেকে আছেন, সকালে গীতা পাঠ ছাড়া কোনো ধরনের খাদ্য, পানীয় পর্যন্ত গ্রহণ করেন না। গীতাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃতঃ বাণী ভেবে পূণ্যলাভের জন্য যা যা করা দরকার, তার সবই তারা করেন।

গীতার রচনার প্রেক্ষাপট হচ্ছে এ রকম : কৌরব আর পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে বলে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পড়েন। অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করতে শ্রীকৃষ্ণ অনেক যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেন। এই ধরনের যুক্তি-তর্কে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেন, তাই গীতার বিষয়বস্তু। গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন নামে ডাকছেন, যেমন— হৃষিকেশ, মধুসূদন, জনার্দন, বার্ষ্ণেয়, গোবিন্দ, অরিসূদন, কেশব ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কিছু বলছেন, তখন বলা হচ্ছে 'শ্রীভগবান উবাচ'। এ কারণেই হয়তো গীতাকে

ভগবদ্‌গীতা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান দ্বারা যা গীত হযেছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (১২৩টি অধ্যায়ের মধ্যে) ২৫-৪২ পরিচ্ছেদের ১৮টি অধ্যায়ে বর্তমানে প্রচলিত গীতা। এই আঠারোটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে সর্বমোট ৭০০টি শ্লোক। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভগবদ্‌গীতা আরম্ভ হবার পূর্বে ২৪টি এবং ভগবদ্‌গীতা শেষ হবার পরে আরো ৮১টি অধ্যায় রয়েছে। আপাত ধরে নেয়া যাক, মহাভারতের ভীষ্মপর্বেই সর্বপ্রথম গীতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

গীতাকে সর্বপ্রথম শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০) মহাভারত থেকে বিছিন্ন এবং স্বাধীন-স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করাচার্যের পূর্বে গীতা রচিত হবার পর মূলত মহাভারতের সাথেই অঙ্গীভূত ছিল, তাই স্বতন্ত্র-স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থরূপে এর কোনো স্বীকৃতি ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস, কৃষ্ণ পরবর্তী বিষ্ণুর অবতার হলেন শঙ্করাচার্য। শঙ্করাচার্য যখন নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে গীতাভাষ্য রচনা করেন, তখন তিনি উপক্রমণিকায় (ভূমিকা/মুখবন্ধ) বলেন, "... গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহ স্বরূপ, এবং এর অর্থ বোঝা অত্যন্ত কঠিন। এর অর্থ আবিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে অনেকে এর পদ, পদার্থ, বাক্যার্থ এবং যুক্তি বিবৃত করলেও লোকে সেসব অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী অনেক অর্থে গ্রহণ করে থাকে, এই উপলব্ধি থেকেই আমি এর বিবেকসম্মত অর্থ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে এর বিবরণ দিচ্ছি।" কিন্তু শঙ্করাচার্যের দাবি মতো পূর্ববর্তী কোনো গীতাভাষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি; আর ভুল-পরস্পরবিরোধী অর্থ বা ব্যাখ্যা তো অনেক পরের কথা! কিংবদন্তীতে এক সময় শঙ্করাচার্যের পূর্বে 'বৌধায়নের গীতাভাষ্যের' কথা শোনা যায়, কিন্তু এরকম কোনো গীতাভাষ্যের অস্তিত্ব বাস্তবে কখনো পাওয়া যায়নি। অতএব, শঙ্করাচার্যই যে সর্বপ্রথম মহাকাব্য মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে 'গীতাশাস্ত্র'রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, গীতাবিশেষজ্ঞরা এই সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই তাহলে যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, পল্লবিত মহাভারতে গীতা সংযুক্ত হবার এত কাল পরে কেন শঙ্করাচার্য মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর নিজের দাবি মত 'বিবেকসম্মত ভাষ্য' তৈরি করে তার মাধ্যমে 'ভগবান নির্দিষ্ট ধর্ম' প্রচার করলেন?

শঙ্করাচার্যের সময়কালে (নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে) কিংবা তারও আগে এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্যধর্মের (বর্তমানের হিন্দু ধর্ম) সামনে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশাল চ্যালেঞ্জরূপেই দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চাতুর্বর্ণ প্রথা-নিয়মনীতি, নারী ও শূদ্রদের প্রতি মনুবাদীদের বীভৎস আচরণে অতিষ্ঠ, সেকালে বৌদ্ধ-জৈনধর্মের উদার-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের পরিচ্ছন্ন রীতিনীতি, বর্ণশ্রমের কঠোর বিরোধিতা, বস্তুবাদী জ্ঞানচর্চার প্রতি আকর্ষণ, গণমানুষকে বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। দলে-দলে শূদ্র-বৈশ্য ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। সমাজের নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি

উল্টোমুখ হওয়াতে সমাজের শোষকশ্রেণী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সামনে মারাত্মক অস্তিত্বের সংকটরূপে দেখা দেয়। আবার গুপ্তযুগে এবং তার পরে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং এই সমস্যার একটি সমন্বয়ধর্মী সমাধান প্রয়োজন ছিল। এতো গেল স্থানীয় সমস্যা, এছাড়া পঞ্চম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিদেশি হুন আগ্রাসন উত্তর ভারতকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল; গুপ্ত ও পাল রাজারা শেষ পর্যন্ত হুন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলেও এরা বিশাল সংখ্যায় ভারতে বসতি স্থাপন করে রাজপুত জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের 'গুদের উপর বিষফোড়া' হিসেবে দেখা দেয়। এছাড়া সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা সিন্ধুদেশ দখল করে নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সামনে মস্ত বড় বিপদ সংকেত হিসেবে আবির্ভূত হয়। তৎকালীন ভারতের ভিতর-বাহিরের এ অস্থিতিশীল অবস্থা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে 'আত্ম-পরিচয়ের সংকটে' ঠেলে দেয়। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এ সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ দর্শন, মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে উপস্থাপন-প্রচার, ধর্মীয় ভক্তি-আন্দোলন—দুর্দশাগ্রস্থ বাস্তব পরিস্থিতিকে আড়াল করে একটি জাগতিক সমাধান সূত্র ও 'ঈশ্বরভক্তিতে মুক্তি'র অলীক প্রেরণা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। আর এই মুক্তির মূল তাত্ত্বিক প্রেরণা আবার আসে ভগবদ্গীতা থেকে।

শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক আদর্শকে শক্তিশালী করার জন্য, বদরী, দ্বারকা, পুরী এবং শৃঙ্গেরীতে হিন্দু ধর্মের চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, শঙ্করাচার্যের পরম্পরা সৃষ্টি করেন, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করে হিন্দু ধর্মকে এক সর্বভারতীয় সাংগঠনিক রূপ দান করেন। প্রধানত শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী ভক্তদের ধর্মীয় এবং সাংগঠনিক তৎপরতার ফলেই শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়, নির্বিশেষে হিন্দু ধর্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আর দশম শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম কার্যত হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় (দ্রষ্টব্য : *সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা*, পৃষ্ঠা ২০)।

গীতার রচয়িতা কে তা অজানা। যেমন জানা যায় না প্রাচীন ভারতীয় অনেক লোকগাঁথা আর ধর্মীয় পুস্তক (বৌদ্ধ ধর্মের জাতক কাহিনী, উপনিষদ ইত্যাদি) রচয়িতার নাম। তবে গীতার অনেক ভাষ্যকার রয়েছেন; রয়েছে তাঁদের সম্পাদিত নানা ধরনের টীকা। বস্তুত টীকা ছাড়া গীতা বোঝা খুবই কঠিন। গীতার নানা ভাষ্যকার, যার-যার বিশ্বাসমতো গীতার ভাষ্য লিখেছেন, ফলে এঁদের টীকা পড়লে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতের চাপে একজন পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। গীতার ভাষ্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধরস্বামী মাধ্বাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ।

ভারতবর্ষে বিট্রিশ শাসনামলে 'গীতার ধর্মযুদ্ধ ও কর্মযোগের তত্ত্বকে' হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস চালান বঙ্কিমচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলকসহ প্রমুখ

(দ্রষ্টব্য : *সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা*, পৃষ্ঠা ২৪-২৭)। বিট্রিশরা গীতাকে 'সন্ত্রাসে প্রেরণাদানকারী' গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতো এবং গীতা বহন, পাঠের অভিযোগে নানাজনকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করা হত।

বর্তমান সময়ে অনেক হিন্দু বা নন-মুসলিমরা ইসলাম ধর্ম ও কোরান শরিফ নিয়ে বেশ চিন্তিত এবং আতঙ্কিত। তাঁদের মতে, ইসলামি জেহাদিরা কোরান শরিফের কিছু 'উত্তেজক' আয়াত (যেমন, ২:১৯১-১৯৩, ২:২১৬, ৩:৮৫, ৯:৩৯, ৯:৭৩ ইত্যাদি) থেকে 'জেহাদ' সম্পর্কে আল্লাহার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেয়ে পৃথিবীটাকে 'দারুল-ইসলাম' বানানোর জন্য নন-মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আত্মঘাতী বোমা হামলা করছে।

ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় *সাংখ্যযোগে* উল্লেখ আছে শত্রুবিনাশের লক্ষ্যে 'ধর্মযুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ (২:২১) : "যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলে জানেন, হে পার্থ, সে পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত্যা করেন বা করান? " তার মানে, আত্মা অবিনাশী বলে জানেন যিনি, তিনি মানুষ হত্যা করলেও হত্যাকারী হিসেবে দোষী সাবস্যস্ত হবেন না। পরের শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (২:২২-৩১) : "মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। ... অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিৎ নয়। ... যে জন্মে তাহার মরণ নিশ্চিৎ, যে মরে তাহার জন্ম নিশ্চিত; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিৎ নয়। ... স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত কম্পিত হওয়া উচিৎ নয়। ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছুই নেই।" এর পরের শ্লোকে ভগবান ঘোষণা করেন, "ধর্মযুদ্ধ না করলে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া তুমি পাপযুক্ত হইবে (২:৩৩), সকল লোকে তোমার অকীর্তি ঘোষণা করিবে, অকীর্তি অপেক্ষা মরণও শ্রেয় (২:৩৪)। আর "ধর্মযুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গে যাইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে" (২:৩৭)। "অতএব সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তুল্যজ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য উদ্‌যুক্ত হও; এতে পাপভাগী হইবে না।" (২:৩৮)। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে, যুদ্ধের জন্য আবারো প্রণোদিত করতে থাকেন এভাবে (বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ, ১১:৩৩-৩৪) : "তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও; শত্র জয় করিয়া যশঃ লাভ কর, নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ কর। হে অর্জুন, আমি ইহাদিগকে পূর্বেই নিহত করিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও। ... যুদ্ধবীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত করিয়াছি। এখন তুমি সেই হতগণকে নিহত কর; ভয় করিও না; রণে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করিতে পারিবে, যুদ্ধ কর।" গীতার সর্বশেষ অধ্যায় *মোক্ষযোগ*-এ শ্রীকৃষ্ণ বলেন (১৮:১৭) : 'আমি কর্তা'—এই ভাব নাই যার (নিরহংকার), যার বুদ্ধি, কার্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হত্যা করলেও কাউকে হত্যা করেন না এবং তার ফলভাগী হন না।"

উত্তেজক-আক্রমণাত্মক নির্দেশাবলী কি কেবল কোরান শরিফেই আছে? গীতাতে নেই?

কোরানে বর্ণিত জেহাদের সাথে গীতার ধর্মযুদ্ধের তফাৎ কোথায়?

বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত অনুযায়ী গীতা ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক, পশ্চিমা পণ্ডিত গীতাকে আদি মহাভারতের অঙ্গ বলে মনে করেন না, বরং পরবর্তীকালের পল্লবিত মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত সংযোজন বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিলক, ভাণ্ডাকর, রাধাকৃষ্ণণসহ প্রমুখ ভারতীয়, আর লাসেন, লরিনসার, গারবে, ভ্যান বুইটিনেন প্রমুখ পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ। ভগবদ্‌গীতা আদি মহাভারতে ছিল না, পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে, এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁদের কিছু যুক্তি *সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা* গ্রন্থ (পৃষ্ঠা ৩১-৩৩) থেকে নীচে তুলে ধরা হলো :—

(১) মহাভারতের উপক্রমণিকার সংক্ষিপ্তসারে অথবা আদিপর্বের প্রথমে দেয়া সংক্ষিপ্তসারে গীতার উল্লেখ তো দূরের কথা, কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কোনো কথোপকথনেরই উল্লেখ নেই। যদিও অনেক তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ আছে। দুটি সংক্ষিপ্তসারই আদি মহাভারতে গীতা সংযোজিত হবার আগে রচিত হয়েছিল এবং পরে তা আর সংশোধন করা হয়নি, এ অনুমান যুক্তিসম্মত।

(২) উপরোক্ত দুটি সংক্ষিপ্তসারে, অথবা আদিপর্বের সুদীর্ঘ 'ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে' কোথাও 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটিই নেই। মনে হয় একটি বড় জ্ঞাতিযুদ্ধের লোকগাঁথা মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

(৩) জার্মান পণ্ডিত লাসেন এবং অ্যালব্রেখট্ ওয়েবার, ইংরেজ পণ্ডিত মনিয়ের উইলিয়ামস্‌সহ অনেক বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে একমত যে, পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা মাত্র, এবং যে যুদ্ধের কথা প্রাথমিক পর্যায়ের মহাভারতে ছিল তা প্রকৃতপক্ষে কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের নয়। মহাভারতে পাণ্ডব পক্ষের অস্তিত্ব এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের মুখ্য ভূমিকা পরবর্তীকালের সংযোজন। বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডবদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ প্রধানত কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ।

(৪) সাংখ্য দর্শন এবং যোগ দর্শনের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে গীতার রচনাকারের পরিচয় ছিল। অথচ এইসব দর্শন গড়ে উঠবার আগেই মূল মহাভারত রচিত হয়েছিল। অতএব গীতার পরবর্তীকালের রচনা এবং পল্লবিত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

(৫) ভাষা ও রচনাশৈলীর বিচারে গীতা মূল মহাভারতের চেয়ে আরও বিবর্তিত, অতএব আধুনিক এবং প্রক্ষিপ্ত।

(৬) মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে হঠাৎই ভগবদ্‌গীতা আরম্ভ হচ্ছে এবং দীর্ঘকাল পরে শেষ হচ্ছে। যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ অকারণে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। গীতা আরম্ভ

হবার আগে দু'পক্ষের শংখনাদের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয়ে গেছে। আবার আঠারো পরিচ্ছেদের গীতা শেষ হওয়া মাত্রই যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। এত দীর্ঘ সময় কৃষ্ণ ও অর্জুন ছাড়া বর্ণিত লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা কী করছিলেন তার কোন ব্যাখ্যা নাই। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা পরম্পরা, রচনা বিন্যাস, ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংলাপ এবং সাহিত্যকতার বিচারে মহাভারতে গীতা সংক্রান্ত কিছু না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এই সামঞ্জস্যহীনতা কোন মহাকবির কলমে সম্ভব নয় বলে মনে হয়। মহাভারতের অঙ্গ হিসেবে ভগবদ্গীতার এই সাহিত্যিক অসংগতিটির দিকটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন— "...কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থামিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহে অপরাধ। ...যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই।"

(৭) ভগবদ্গীতা শেষ হয়ে যাবার অনেক পরে নবম দিনে যুদ্ধের সময় অর্জুনের আচরণ এবং কৃষ্ণার্জুন সংলাপ গীতা প্রবচনের ঘটনার সঙ্গে সংগতিবিহীন...।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণসহ বিভিন্ন গীতা বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতকের মধ্যে ভগবদ্গীতা পর্যায়ক্রমে রচিত, পরিবর্ধিত এবং মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছিল। আর এই সময়টাই ছিল মহাভারতে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের যুগ। (দ্রষ্টব্য : *সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা*, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮)।

গীতার শ্রীভগবান

গীতাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী বলে সম্মান করে থাকেন, পূজা করে থাকেন। আর এই ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বিষ্ণুর স্বয়ং অবতার, তিনি মহাকাল; তিনি সময়ে সময়ে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। (দ্রষ্টব্য : গীতা, ৪:৭-৮, ১০:২১, ১১:২৪, ১১:৩০, ১১:৩২)। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিষ্ণু কে? (মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে নানা সন্দেহ ও সংশয় রয়েছে। এ বিষয়ে আগ্রহীরা পড়তে পারেন *মহাকাব্য ও মৌলবাদ*, পৃষ্ঠা ৬৮-১০৮)। শ্রীকৃষ্ণ যদি সত্যিই জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবুও তিনি 'বিষ্ণু' নামক ভগবানের অবতার হতে পারেন কী-না।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা জানি যে, প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব ছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ যেমন ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত-বন্যা, দাবানল কিংবা রাতের বেলা চন্দ্র, দিনের বেলা সূর্য, জোয়ার-ভাটার

খেলা, বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ঋতুর চক্রাকারে আগমন ইত্যাদি মানুষকে বিপুল পরিমাণে বিস্মিত করতো; প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে 'জীবন' আছে, আস্তে আস্তে এই ধারণাও তাদের মধ্যে কাজ করে, সৃষ্টি করে প্রচণ্ড ভীতির; ফলে সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতিকে বিভিন্ন দেবদেবীরূপে কল্পনা করতো। তেমনিভাবে পৃথিবীতে অগ্নি, জল, মাটি পর্বত, নদী, বন প্রভৃতি অনেক প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেই দেবদেবীর আধিষ্ঠান কল্পনা করতো; যেমন গ্রিক কিংবা রোমানদের প্রাচীন উপাখ্যান থেকে জানা যায়, তারা সমুদ্রের দেবতা হিসেবে নেপচুন, পৃথিবীর অভ্যন্তরের পাতালের দেবতা হিসেবে প্লুটো এবং আগ্নেয়গিরির দেবতা হিসেবে ভালকানকে পূজা করতো। মোট কথা হচ্ছে আদিম-অসহায় মানুষ প্রকৃতির এই রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে যৌক্তিক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পেরে 'মানুষের থেকে শক্তিশালী' একাধিক দৈবশক্তির কারবার বলেই ধরে নিত। আর এই দৈবশক্তিকে নিজেদের বশে রাখার উদ্দেশ্যে-তুষ্ট রাখার জন্য (কিংবা অজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, কল্পনা থেকেও) প্রার্থনা-উপাসনার সৃষ্টি করে; সৃষ্টি করে বিভিন্ন দেবদেবীর, ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর এভাবেই সৃষ্টি হয় ধর্মগুলোর। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারাই এমন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আধুনিককালের গবেষকেরা।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এখনো শিবলিঙ্গ হিসেবে পাথরকে, গঙ্গা নদীকে দেবী হিসেবে, রামায়ণের কাহিনি থেকে হনুমান বানরকে, কৃষ্ণের বাহন হিসেবে গরুকে, মনসাদেবীরূপে সাপকে পূজা করেন। প্রাচীনকালের মানুষের উপাসনার রীতিনীতি আর বিশ্বাস এই আধুনিককালের হিন্দুদের মধ্যেও বর্তমান।

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর, শক্তিশালী, এবং সর্বব্যাপী সত্তা ছিল সূর্য, আর তার পরেই ছিল চন্দ্র। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহকেও দেবতা জ্ঞান করা হতো। এর মধ্যে সূর্যের প্রখরতার জন্য তাকে পুরুষ দেবতা এবং চাঁদের স্নিগ্ধতার জন্য তাকে সাধারণত দেবী হিসেবে কল্পনা করা হতো (ব্যতিক্রম আরবদেশে চাঁদকে পুরুষ দেবতা আর সূর্যকে নারীদেবতা হিসেবে গণ্য করা হত)।

প্রাচীন মিশরে 'রা' এবং গ্রিসে 'এপোলো' নামে সূর্যকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে পূজো করা হতো। ভারতবর্ষেও বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সূর্যকেই প্রধান দেবতা রূপে কল্পনা করা হতো। প্রাচীনকালে গ্রিসে এবং ভারতের অভিজাত শ্রেণী রথে চড়ে যাতায়াত করতেন। তাই এসব দেশে কল্পনা করা হতো যে, আকাশে সূর্যদেবতাও রথে চড়ে যাতায়াত করেন, আর বিভিন্ন দেবতা তার রথের অশ্ব-সারথি ইত্যাদি। আধুনিক যুগেও ভারতে এরকম ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল; কোণারকের সূর্যমন্দিরসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য সূর্যমন্দির তার প্রমাণ। আবার মিশরীয়দের কাছে নীলনদ ছিল যাতায়াত-ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। তাই তারা কল্পনা করতো দেবতাশ্রেষ্ঠ সূর্য আকাশ পথে নৌকায় করে যাতায়াত করেন আর বাকি দেবতারা সেই নৌকার মাঝি।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সূর্য আর বিষ্ণুর মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মহাকাব্য ও মৌলবাদ* গ্রন্থ থেকে তুলে ধরা হল। লেখক উক্ত গ্রন্থে বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, শুক্লযজুর্বেদ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন শ্লোক বা উদ্বৃতি তুলে ধরে স্থির সিদ্ধান্তরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে 'সূর্য'কেই দেবতাশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু হিসেবে গণ্য করা হতো। 'বিষ্ণু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ (বিষ্ণু = বিস্তার + নু) যার বিস্তার বা ব্যাপ্তিই পরিচয়। পৃথিবী থেকে আপাতদৃষ্টিতে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকালে মনে হয় সূর্যেরই আছে একমাত্র এই পরিচয়; অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলো সূর্যের পাশে একদম ম্রিয়মাণ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬-১৭ ঋকে একই সঙ্গে অশ্বীদ্বয়, সবিতা এবং বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এখানে দুটি ঋকে তিন পাদবিক্ষেপে বিষ্ণুর পৃথিবী পরিক্রমার কথা বলা হয়েছে। নিরুক্ত টীকাকার দূর্গাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন : "বিষ্ণুরাদিত্যঃ।... সমারোহণে উদয়গিরৌ ঊদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণু পদে মধ্যন্দিনেহন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।" ভাবার্থ হচ্ছে, সূর্যই বিষ্ণু, তার উদয়কালীন, মধ্যাহ্নকালীন আর অন্তকালীন এই তিন পাদবিক্ষেপ। বিশেষত মধ্যদিনে অন্তরীক্ষে অবস্থিতিই সূর্যের বিষ্ণুত্ব। বিষ্ণুর এই তিন পাদে পৃথিবী পরিক্রমার কথা ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি সূক্তে আছে; এগুলো হচ্ছে, ৯/১৫৪/১-৬, ১/১৫৫/৪-৬, ১০/৩৭/৮। এছাড়া ঐ ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তের ৫নং ঋকে বলা হয়েছে যে, "মানুষেরা বিষ্ণুর দুই পাদই অবলোকন করতে পারে এবং ধারণা করতে পারে। তৃতীয় পাদ মানুষেরা ধারণা করতে পারে না, এমনকি উড্ডীয়মান পাখিরাও প্রাপ্ত হইতে পারে না।" অর্থাৎ মধ্যাহ্নের সময় সূর্যকে নিরীক্ষণ করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং পাখিদের পক্ষেও তার কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব। একই সূক্তের পরবর্তী ৬নং ঋকে বলা হয়েছে যে, "বিষ্ণু চারটি নব্বই দিনকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেন।" বোঝা যায় বৈদিক যুগে প্রচলিত চার ঋতুর নিয়ন্তা হিসেবে সূর্যের কথা এখানে বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদের ১/১৫৪/৪-৬, ১/১৫৫/৪, ১০/৩৭নং সূক্তে বিষ্ণু এবং সূর্য উভয়কে জ্যোতির উৎস, অন্ন উৎপাদক, জগতের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সূর্য, বিষ্ণু, সবিতা একই দেবতা, অশ্বীদ্বয় তাদের রথের ঘোড়া। আর ঊষা এবং রাত্রি এই দুই দেবী সূর্য এবং বিষ্ণুর গতি দ্বারাই সৃষ্ট। প্রাচীনকালে বড় বড় প্রাকৃতিক সত্তাগুলির বিভিন্ন নাম দেয়া হত; কিন্তু এসব বিভিন্ন নাম একই সত্তাকে নির্দেশ করতো। সূর্যের বিভিন্ন নাম সম্বন্ধে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৬৪নং সূক্তের ৪৬নং ঋকে বলা হয়েছে: "এই আদিত্যকে জ্ঞানীগণ ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট এবং সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও বিপ্রগণ একে বহু নামে অগ্নি, যম ও মাতারিশ্বা বলে থাকেন।"

মনে রাখা দরকার সূর্যের ত্রিপাদ বিক্ষেপের রূপক থেকেই সম্ভবত পরবর্তীকালে ত্রিপাদে

বিশ্বভুবন অধিকার এবং বলি দমনের পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়েছিলো। ঋগ্বেদের ১০/১/১-৩ নং ঋকে স্পষ্ট বলা হয়েছে অগ্নি, সূর্য, বিষ্ণু একই দেবতা। দশম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকে অগ্নি এবং সূর্য অভিন্ন করে বলা হয়েছে "ভোর হতে না হতে বৃহৎ এবং সৌন্দর্যময় অগ্নি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আলোকজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করলেন এবং উজ্জ্বল রশ্মি দিয়ে সমস্ত বিশ্ব আলোকিত করলেন।" পরবর্তী ২য় ঋকে এই অগ্নিরূপী সূর্যকে 'আশ্চর্য বালক' বলে সম্বোধন করা হয়েছে; এবং এর পরবর্তী ৩য় ঋকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই অগ্নিই বিষ্ণু, কারণ তিনি চারদিকে ব্যাপ্ত। ১০/৩/১-২নং ঋকে আবার একইভাবে সূর্যকে অগ্নিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১০/৫/৭ নং ঋকে আবার বলা হয়েছে যে, অগ্নিই সূর্যরূপে ঊর্ধাকাশে অবস্থান করছে। সামবেদ সংহিতাতে (১৭/১/১/১৬২৫-২৬) বলা হয়েছে "হে বিষ্ণু ! এই যে তুমি বললে আমি বালরশ্মি দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই কি তোমার একমাত্র রূপ? তুমি সংগ্রামের (আপাত ক্রুদ্ধ অবস্থায় মধ্যদিনে) অন্যরূপ ধারণ করে থাকি; আমাদের কাছে তোমার সেই অন্যরূপ প্রকাশিত কর। ... আমি অতি ক্ষুদ্র, আর তুমি অন্তরীক্ষে লোকের অতি দূরে নিবাসকারী। সেই মহান তোমাকে আমি স্তব করছি।" আবার সামবেদ সংহিতায় (১৮/২/৫/১৬৭০-৭৪) বলা হয়েছে, "বিষ্ণু এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন। এর পদ সুদৃঢ়রূপে অন্তরীক্ষে স্থাপিত। ইনি তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন। বিষ্ণু গোপা অন্তরীক্ষে অবস্থান করে তিন পাদের দ্বারা পৃথিবী পরিক্রমা করেন। এবং সকল ধর্মকে ধারণ করেন। ...যখন বিষ্ণু পৃথিবীর সর্বত্র পরিক্রমা করেন, তখন রশ্মিরূপে দেবগণ আমাদের জন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।" এছাড়াও শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় (যেমন ২/২৪-২৬, ৩/৬, ৪/২৯-৩০, ৫/১৪-১৫, ৫/৩৭, ৫৪১, ৯/৩১, ৭/১৬) প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সূর্য ও বিষ্ণুর অভিন্নতার তত্ত্ব বারবার উল্লেখিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪/১/১/১৫-১৬) বলা হয়েছে, "যজ্ঞের ফল বিষ্ণু প্রথম পেয়েছিলেন, তাই তিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি বিষ্ণু, তিনি যজ্ঞ, তিনিই আদিত্য।" (বিস্তারিত আলোচনার জন্য পড়ুন *মৌলবাদ ও মহাকাব্য*, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩৩)।

সূর্য উপাসনা ছিল বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো এদেশের তৎকালীন লোকেরা উপলব্ধি করেছিল যে, আকাশের সূর্যই আমাদের এ পৃথিবীতে আলোকের, প্রাণের এবং অন্নের উৎস। অতএব এই শক্তিমান সূর্যকেই ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা (পুরোহিত শ্রেণীর লোক) শ্রেষ্ঠ দেবতা জ্ঞান করে যজ্ঞের মাধ্যমে নিরন্তর স্তুতি করতেন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উপহার দিতেন, নিজেদের সামূহিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য তার কাছে প্রার্থনা জানাতেন।

সৌরজগতে সূর্য কতিপয় গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি নক্ষত্র মাত্র। সূর্যের ভেতরের মূল রাসায়নিক উপাদানসমূহ হচ্ছে, হাইড্রোজেন-৯২.১%, হিলিয়াম-৭.৮%, অক্সিজেন-০.০৬১%, কার্বন-০.০৩০%, নাইট্রোজেন-০.০০৮৪%, নিয়ন-০.০০৭৬%, লৌহ-

০.০০৩৭%, সিলিকন-০.০০৩১%, ম্যাগনেসিয়াম-০.০০২৪%, সালফার-০.০০১৫% এবং অন্যান্য-০.০০১৫%। সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন গ্যাস, ৫৯৬ মিলিয়ন টন হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে আর বাকি ৪ মিলিয়ন টন শক্তিতে পরিণত হচ্ছে; যা আমরা আলো হিসেবে অবলোকন করে থাকি। সূর্যের ভিতরের এই বিপুল পরিমাণ শক্তির উদ্‌গিরণের ফলে সূর্যপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪০,০০০ ওয়াট আলোক নিঃসৃত হয়। যদিও এই মহাবিশ্বে সূর্যই একমাত্র বড় বা আলোক উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, সূর্যের থেকে হাজারগুণ বড় এবং আলোকউজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই গ্যাসীয় পিণ্ড কী আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারে?

প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ বিকাশ হয়নি বলে তারা এই ধরনের ভ্রান্ত জ্ঞানের শিকার হয়েছিলেন, এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো দোষ দেখছি না; হয়তো সেই সময় আমরাও এরকম ভ্রান্ত জ্ঞান চর্চার শিকার হতাম। কিন্তু আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও বিপুল সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা (এর মধ্যে ডিগ্রিধারী জ্ঞানীগুণী, রথীমহারথী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, আমলা-কামলা থেকে শুরু করে রাস্তার ভিক্ষুক পর্যন্ত রয়েছেন) যখন কৃষ্ণকে বিষ্ণুর (সূর্যের) অবতার বলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেন, মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন কি সম্পূর্ণ না জেনে, না বুঝেই?

গীতায় বিজ্ঞান

গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণে যাওয়ার পূর্বে ইসকন কর্তৃক প্রকাশিত *জীবন আসে জীবন থেকে* গ্রন্থ থেকে স্বামী প্রভুপাদের কয়েকটি বাক্য (পৃষ্ঠা ২) তুলে দেয়া হল: "একটা কুয়োতে একটা ব্যাঙ ছিল এবং তার এক বন্ধু এসে যখন তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বলল, তখন সে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, "ওঃ, এই প্রশান্ত মহাসাগরটি কি?" বন্ধু উত্তর দিল, "এটা একটি মহাসাগর—একটি প্রকাণ্ড বড় জলাশয়।" "কত বড়? এই রকম দুটো কুয়োর মতো?" তার বন্ধু উত্তর দিল, "না, না—তার থেকে অনেক বড়।" "কত বড়? এই রকম দশটা কুয়োর মতো? বিশটা কুয়োর মতো?" এইভাবে ব্যাঙ মশাই সমুদ্রের আয়তন সম্বন্ধে অনুমান করতে লাগলেন। কিন্তু এইভাবে কি কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালতা উপলব্ধি করা যাবে? আমাদের ক্ষমতা, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের অনুমানশক্তি অত্যন্ত সীমিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত অনুমানগুলি এই ব্যাঙ মশাইয়ের দর্শনের মতো।" আবার ঐ গ্রন্থের ৭নং পৃষ্ঠায়ও একই কথা বলা হয়েছে।

গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণুর অবতার) এই বিশ্ব-মহাবিশ্ব সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। মনুষ্যজাতি থেকে শুরু করে সকল প্রাণী-উদ্ভিদ, জীব-জড় সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তিনি

সবকিছুতেই আছেন, তিনি সর্বজ্ঞানী, তিনি লোকক্ষয়কারী।

গীতার ভগবান মোক্ষযোগ অধ্যায়ে (১৮:৬১) বলেন : "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি/ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" অর্থ হচ্ছে, হে অর্জুন, ভগবান প্রাণীগণের হৃদয়ে বাস করে যন্ত্রারূঢ় পুতুলের মতো মায়া দ্বারা ভ্রমণ করান। ভগবান প্রাণীগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন? তা হৃৎপিণ্ড কি? কেনই-বা হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করবেন? ওটা তো অনেকটা পাম্প মাত্র, যা সারা শরীরে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। আধুনিককালে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন সমস্যার কারণে ওপেন হার্ট সার্জারি-বাইপাস সার্জারি করা হয়, কিন্তু আত্ম-পরমাত্মা-ভগবানের অস্তিত্ব তো পাওয়া যায় না!

প্রসঙ্গক্রমে ইসলাম ধর্মের একটি হাদিস আছে, ফেরেশতারা হযরত মুহম্মদের বক্ষবিদারণ করে হৃৎপিণ্ডের জমা রক্ত যা না-কী 'শয়তানি প্রণোদনার উৎস', তা পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করেছিলেন। এ ধারণাটি হাস্যকর। হৃৎপিণ্ড ধোয়ে-পরিষ্কার করে পাপ-চিন্তা দূর করা অসম্ভব; কারণ আমাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি (সেটা যতই ঈশ্বর লাভের চেষ্টায় বিভোর থাকুক কিংবা শয়তানি-কূটবুদ্ধি চালিত হোক) সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। তাই প্রয়োজন মস্তিষ্ক ধৌত করা!

আসলে প্রাচীনকালে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত ছিল না, তখন মানুষ ভাবতো হৃৎপিণ্ডই সবকিছু (আপাতদৃষ্টিতে সারা শরীরের মধ্যে একমাত্র হৃৎপিণ্ডেরই স্পন্দন স্পষ্ট এবং সহজে অনুভব করা যায়), যেমন ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে হৃৎপিণ্ড (ভুলভাবে আপেলের মতো) অঙ্কিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে।

গীতার কর্মযোগে (তৃতীয় অধ্যায়); সেখানে তিনি বলেন (৩:১৪) : "প্রাণীগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়, কর্ম হইতে যজ্ঞ হয়।" 'যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়'। বৃষ্টি কিভাবে হয়? 'পানিচক্র' সম্পর্কে কোনো ধারণা গীতার রচিয়তাদের ছিল না।

গীতার চতুর্থ অধ্যায় *জ্ঞানযোগে* ভগবান অর্জুনকে বলেন (৪:৫), "তোমার এবং আমার বহু জন্ম হয়েছে; আমি সে সকল জানি, তুমি তা জান না।" আবার দশম অধ্যায়ে *বিভূতিযোগে* ভগবান বলেন (১০:৩), "তাঁর আদি নাই, জন্ম নাই, সর্বলোকের মহেশ্বর তিনি"। স্ববিরোধী বক্তব্য।

স্ববিরোধিতার আরো কিছু উদাহরণ। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে (মোক্ষযোগ, ১৮:৪০) বলেন, "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।/সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥" মানে হচ্ছে, পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে প্রকৃতিজ ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হতে পারে। ত্রিগুণটা কি? (গীতার ভাষ্যে) ভগবানের মতে, ত্রিগুণ হচ্ছে সত্ত্ব, রজো, তম! কিন্তু গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগের ৪৫নং শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেন, "বেদ ত্রিগুণাত্মক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত হও!" কিভাবে সম্ভব?

গীতার সন্ন্যাসযোগের ১৫নং শ্লোকে শ্রী ভগবান বলেছেন, বিভু (ভগবান) কারো পাপ বা পূণ্য গ্রহণ করেন না। একই ধরনের বক্তব্য, রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগে (৯:২৯) ভগবান বলেন, "সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।" বাংলা হচ্ছে, আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান (সমদৃষ্টিসম্পন্ন)। আমার কোনো বিদ্বেষভাজন নেই, প্রিয়ও নেই। অথচ সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগের ১৫নং শ্লোকে দেখা যায়, যারা ভগবানের ঈশ্বরত্বে, ধর্মমতে অবিশ্বাসী, তাদেরকে তিনি 'বিবেকশূন্য', 'নরাধম', 'পাপকর্মপরায়ণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ভগবানের প্রচারিত ধর্মের প্রতি যাদের আস্থা নেই, তারা মৃত্যুময় সংসারে বারবার আবর্তিত হয় (৯:৩)। দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগে ভগবান বলেন (১৬:১৮-২০), "বল, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধের বশবর্তী বিদ্বেষকারী ব্যক্তিগণকে আমি অশুভ অসুর যোনিতে অজস্রবার নিক্ষেপ করে থাকি। মূঢ়েরা জন্মে-জন্মে অসুরযোনিপ্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পেয়ে আরো অধমগতিপ্রাপ্ত হয়" (মহাভারতের অনুশাসনপর্বের ১০২নং শ্লোকে অশাস্ত্রীয় কাজ করার ফলে অধমগতি লাভ করে তির্যকযোনিতে জন্মাবার কথা আছে)।

গীতার ভগবানও অন্য অনেক ধর্মের ঈশ্বরের মতো শুধুমাত্র নিজের ভক্তদের প্রতি দয়াশীল। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর। অন্য ধর্মে এরকম নিরন্তর-জন্মজন্মান্তর ধরে নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শাস্তির বিধান (অসুরযোনিতে নিক্ষেপ) সম্ভবত বর্ণনা নেই।

বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বে পৌঁছুনোর আগে সংগৃহীত তথ্যগুলিতে যদি পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য থাকে, তবে সেই তথ্যগুলি তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেওয়া হয়। বিজ্ঞাসম্মত বলে স্বীকার করা হয় না। অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে এটা বিজ্ঞানের একটা মানদণ্ড।

গীতার বিভিন্ন শ্লোকে ভগবান আত্ম-পরমাত্মা (ঈশ্বর) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বেশিরভাগ বর্ণনা পাওয়া যাবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগে; সেখানে আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, চিরস্থায়ী, সর্বব্যপ্ত, সনাতন আবার সাথে-সাথে এও বলা হয়েছে, আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ইত্যাদি; এমন কী আত্মা হিসেবে ভগবান নিজেকেই দাবি করেছেন (১০:২০)। প্রাচীনকালের চার্বাক দার্শনিকগণ আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেই কবেই, বলেছেন দেহ ছাড়া আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই; ওগুলো জর্ফরীতুর্ফরী, ধূর্ত পণ্ডিতের বাক্যমাত্র! চার্বাকবাদীদের আত্মা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বা তাদের নিজস্ব দর্শন নিয়ে জানতে হলে পড়ুন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের *লোকায়ত দর্শন* বা *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে* গ্রন্থটি। আজকে যুগে বিজ্ঞানও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না; আত্মা বা ভূত ঐ জাতীয় যা কিছু আধোভৌতিক দর্শনের দাবি করে কিছু মানুষ, তা বিজ্ঞানের ভাষায় দৃষ্টিবিভ্রম অথবা মানসিক রোগের লক্ষণ। আত্মার অনস্তিত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে, প্রবীর ঘোষের *অলৌকিক নয় লৌকিক* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে।

গীতার একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ-দর্শনযোগে ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বিশ্বরূপ ধারণ

করলেন (১১:২৩-৩১), ভগবানের আকাশস্পর্শী তেজোময় দীর্ঘ দন্তযুক্ত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু, বহু বাহু, বিশাল ঊরুপদ-উদর বিশিষ্ট উগ্রমূর্তি দেখে অর্জুন ভয় গেলেন, জানতে চাইলেন তিনি কে? উত্তরে ভগবান জানালেন (১১:৩২), "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, লোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি...।" *বিভূতিযোগে* (দশম অধ্যায়) নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলনা করতে গিয়ে ভগবান বললেন (১০:৩১), "তিনি মৎসদের মধ্যে মকর (কুমির), সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা!" গঙ্গা নদী কি খুব বিশাল নদী? কিংবা গঙ্গার সাথে তুলনা করার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। ভগবান নিজেকে মাছের মধ্যে কুমিরের সাথে তুলনা করছেন। কুমির তো মাছ নয়। কুমির হচ্ছে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের সাথে মাছের পার্থক্য অনেকের কাছে পরিষ্কার নয় বোঝা যায়। আবার পানিতে কী কুমিরের থেকে বড় কোনো প্রাণী নেই। নীল তিমি সামুদ্রিক জীব হিসেবে সবচেয়ে বড়। তিমিও মাছ নয়। স্তন্যপায়ী প্রাণী।

বিভূতিযোগে ভগবান নিজের সাথে ঋতু হিসেবে বসন্তের, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ (১০:৩৫), পশুর মধ্যে সিংহ, পাখির মধ্যে গরুড় (এই পাখির নাম শুধু হিন্দু ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়।) (১০:৩০), হাতির মধ্যে ঐরাবত, সাপের মধ্যে বাসুকি (গরুড় পাখির মত বাসুকি সাপের নামও শুধু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়) (১০:২৭-২৮)। মহাভারতের সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত যুধিষ্ঠিরকে বাদ দিয়ে অর্জুনের (ধনঞ্জয়) সাথে তুলনা করেছেন, এমন কী ভগবান নিজের সাথে নিজের তুলনা করেছেন (১০:৩৭)।

দশম অধ্যায়ের আরেকটি শ্লোক (১০:২১) : ভগবান বলেন, "আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কিরণশালী সূর্য, মরুতদের মধ্যে মরিচি, নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র।" ভগবদ্গীতা হচ্ছে সর্বজ্ঞানের আকর, বিজ্ঞানময় কিতাব। চাঁদ ও নক্ষত্র এক নয়। চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত, পৃথিবীর একটা উপগ্রহ মাত্র। পৃথিবী থেকে (আপাতদৃষ্টিতে) রাতের বেলা চাঁদের আলো দেখা যায় বলে অনেকে ভেবে নিয়েছে চাঁদ ও নক্ষত্র এক। ১৫:১২নং শ্লোকে আবারো ভগবান সূর্য-চন্দ্র-অগ্নির তেজকে তার নিজেরই তেজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। সূর্য কি নক্ষত্র নয়? সূর্য একটা নক্ষত্র এবং সূর্যের থেকে হাজার গুণ বড় নক্ষত্রও আছে এ মহাবিশ্বে।

ইসকনের মাসিক পত্রিকা *হরেকৃষ্ণ সমাচারের* ভাষ্য মতে, (নোবেল পুরস্কার নিয়ে যাদের এতো গাত্রদাহ!) সেই নোবেল বিজয়ী আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ ও আপেক্ষিকতার সূত্র গীতা পাঠের ফসল; তারা কি সুনির্দিষ্ট করে বলবেন গীতার কোন কোন শ্লোক পাঠ করে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত ভরশক্তি সমীকরণ ও আপেক্ষিকতার সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন? ইসকনের বই থেকে যে কুয়োর ব্যাঙের গল্প বলা হয়েছিল, প্রকৃত কুয়োর ব্যাঙটা কে?

বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার না-কী পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের তেজ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গীতার একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ, ১১:১২) থেকে শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন : "দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।/যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" বাংলা

করলে দাঁড়ায়, "যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভাব কিঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে।" ওপেনহাইমারের এ ঘটনা সত্য না মিথ্যে, না গুজব, নিশ্চিৎ নই। তবে এ থেকে কি পরমাণু বোমার কোনো সূত্র আবিস্কৃত হয়ে গেল? কিংবা কোনো বৈশিষ্ট্য? কেউ কেউ বলেন, এখান থেকে না-কী বোঝা যায়, হিন্দু ধর্মচিন্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা সিদ্ধান্ত!

কেউবা গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের-ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শাস্তি হিসেবে বারবার অসুরযোনিতে জন্ম দেবার হুঁশিয়ারির মধ্যে জৈববিবর্তন তত্ত্বের প্রমাণ পেয়ে যান। বিষ্ণুপুরাণ মতে একজন ব্যক্তি স্থাবর জন্ম বিশ লক্ষ যোনি, জলচর নয় লক্ষ যোনি, কুর্ম নয় লক্ষ, পাখি দশ লক্ষ, পশু ত্রিশ লক্ষ, বানর চার লক্ষ... এরকম মোট চুরাশি লক্ষ যোনিতে জন্মের পর মানুষ মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে থাকে! আর পুরাণের এ বক্তব্যকে আধুনিককালে জৈববিবর্তন তত্ত্বের সাথে মিলিয়ে (মূলত গোঁজামিল দিয়ে) হিন্দুধর্মগ্রন্থের 'বিজ্ঞানসম্মত' ব্যাখ্যা দেবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। (দ্রষ্টব্য : শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষের *শ্রীকৃষ্ণ*)। কিন্তু ইসকনের দৃষ্টিতে জৈববিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম ব্যাখ্যাদাতা চার্লস ডারউইন হচ্ছেন একজন মহামূর্খ, বিবর্তনবাদ হচ্ছে একটা ভ্রান্ত মতবাদ, এই মতবাদ যত অগ্রাহ্য করা যায়, ততই ভাল... (দ্রষ্টব্য : *জীবন আসে জীবন থেকে*, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯)।

ধর্মগ্রন্থের কোনো বাণীর সাথে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সাথে আপাত মিল পেলেই ঐ ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যকে একেবারে বিজ্ঞানসম্মত দাবি করা যায় না। প্রমাণ লাগে। কর্মফলের কারণে বিভিন্ন হীনযোনিতে জন্মগ্রহণের পর মনুষ্য জন্ম এবং পাপের ফলে পুনরায় হীনযোনিতে জন্মগ্রহণের যে ধারণা দেয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই ব্যক্তি পর্যায়ে (দেখুন গীতার ৯:৩০-৩২, ১০:৩নং শ্লোক)। গীতার ভাষ্য থেকে ধরে নেওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পৃথকভাবে এ ধরনের কথিত অগ্রগতি বা অধমগতি উভয়েই ঘটতে পারে। কিন্তু জৈববিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে জৈববিবর্তন কোনো ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া নয়, বলা যায় এটি সামগ্রিকভাবে একটি প্রজাতির সমগ্র প্রাণীর বা সমগ্র জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বা ঘটনা। জৈববিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে প্রজাতির পরিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক গুণাবলীকে বোঝায়। কোনো পাপ-পূণ্যের কারণকে কিংবা কর্মফলকে বোঝায় না।

জৈববিবর্তন তত্ত্বের মূল ধারণা ও প্রক্রিয়ার সাথে গীতাসহ অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত জন্মান্তরবাদ, কর্মফল ইত্যাদি বক্তব্যের মূলগত দিক থেকে পরস্পর বিরোধিতা-বৈপরীত্য রয়েছে। (যেমন জৈববিবর্তন আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে)। তাই হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কিছু শব্দের আপাত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একে জৈববিবর্তন তত্ত্বের (বা বিজ্ঞানের) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দাবি করা, চরম মূর্খতা-শঠতার লক্ষণ। (দ্রষ্টব্য : *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার*, পৃষ্ঠা ১৮-১৯)। অতএব গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা, কিংবা শাস্তি হিসেবে আসুরিক যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মের হুঁশিয়ারি, এসবই সাহিত্যিক রূপক হিসেবে গ্রহণ করা যায়; বাস্তব ঘটনা বা

বিজ্ঞান হিসেবে কখনো নয়।

এভাবে গোঁজামিল দিয়ে মিলাতে চাইলে তো যে কেউ শুধু ধর্মগ্রন্থ কেন, অনেক কবির যত্রতত্র কবিতা-গানের মধ্যেও বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়ে যাবেন! যেমন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠল রাঙা হয়ে/আমি চোখ মেললুম আকাশে/জ্বলে উঠল আলো/পূবে পশ্চিমে/গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর"। এখন কবিগুরুর এই কবিতা থেকে কেউ যদি আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের চেতনাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট অনুভূতি, আলোক তরঙ্গ, তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ ইত্যাদি পেয়ে যান, বা বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে (আসলে গোঁজামিল দিয়ে) ব্যাখ্যা করতে বসেন, তাকে কি বলা যায়?

কেউ যদি কবিতার লাইন, পংক্তি ইত্যাদির সাথে বিজ্ঞান মেলাতে চান, রূপক অর্থ করে হলেও বিজ্ঞানসুলভ ব্যাখ্যা দিতে চান, তবে সেটা অবশ্যই দোষের, সেটা বর্জনীয়। কাব্য ঢঙে সাজনো হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোকের অনুবাদে গোঁজামিল দিয়ে, চাতুর্যতার সাথে রূপক ব্যাখ্যা করে মিলাতে চাইলে আপনারাও এ রকম অসংখ্য কবির কবিতায় শুধু বিজ্ঞান নয়, জ্যোতিষী কিরো-নস্ত্রাদামুসকে হার মানিয়ে বিভিন্ন ভবিষ্যৎ বাণীও পেয়ে যেতে পারেন! উদাহরণ দিলে হয়তো বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে; কবি জীবনানন্দ দাশের *আট বছর আগের একদিন* কবিতার প্রথম দুই লাইন : "শোনা গেল লাশকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে...।" সবাই নিশ্চয়ই জানেন ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর একটি ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কবি জীবনানন্দ ২২ অক্টোবর মারা যান। এ লাইন দুটো থেকে কি ধরে নিব, কবি আগেই নিজের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন? চাইলে গোঁজামিল দিয়ে 'কবি জীবনানন্দ'কে 'জ্যোতিষী জীবনানন্দ' বানিয়ে দেয়া যাবে!

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কবিতাতেও না-কী কবির শেষসময়ের অসুস্থতার খবর খুঁজে পেয়েছেন কেউ কেউ! যুক্তি হিসেবে তুলে ধরছেন কবির *চক্রবাক* কাব্যগ্রন্থের *বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি* কবিতার মধ্যের কিছু লাইন : "তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,/কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।/—নিশ্চল নিশ্চুপ/আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।" আবিষ্কারকর্তার বলিহারি এ আবিষ্কার দেখে আমি নিজেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম তৎক্ষণাৎ!

গীতায় শ্রীভগবানের উবাচ

ভারতবর্ষে বৈদিকযুগের সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার শেণীতে বিভক্ত ছিল। সমাজের উপরতলার মানুষ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা আর নিচুতলার মানুষ বৈশ্য আর শূদ্ররা। সমাজ-কাঠামোর সকল সুযোগ-সুবিধা, শাসন-ক্ষমতা ভোগ করতো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শোষক-গোষ্ঠী আর উদয়-অস্ত শ্রম দিয়ে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা, ভোগের যোগান টিকিয়ে রাখতো বৈশ্য-শূদ্ররা।

শূদ্রের সৃষ্টি সম্পর্কে মনুসংহিতা বলা হয়েছে, লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টি করলন (১:৩১); আর কিছু পরের শ্লোকে (১:৯২) আছে, ব্রহ্মার কাছে নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর, এর মধ্যে মুখ পবিত্রতম। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে (৩৫/১) বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রই অন্য বর্ণের গুরু! ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে, সেই বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য ঊরু এবং শূদ্র পদ (১০/৯০/১২); মহাভারতের শান্তিপর্বের ৪৬নং শ্লোকে হুবহু একই ভাষায় চতুর্বর্ণের কথা বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় (১:৯১) ঈশ্বর কৃর্তক নির্দেশিত শূদ্রের একটি মাত্র কর্মের কথা বলা হয়েছে, সেটা হল বাকি তিন বর্ণের অসূয়াহীন সেবা। কিন্তু তিন বর্ণের কাজের মধ্যে ব্রাহ্মণের কাজ অধ্যাপনা-যাজন-যজন-দান-প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের কাজ লোকরক্ষা-দান-অধ্যয়ন-যজ্ঞ, বৈশ্যের কাজ পশুপালন-দান-অধ্যয়ন-কৃষি ইত্যাদি (১:৮৮-৯০)। মনুসংহিতার ২:৩১ শ্লোকে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের নাম শুভসূচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলবাচক, বৈশ্যের নাম ধনবাচক আর শূদ্রের নাম হবে নিন্দাবাচক! ১০:৩১নং শ্লোকে বলা হয়েছে শূদ্র সক্ষম হলেও ধন সঞ্চয় করতে পারবে না! শূদ্রের দাসত্ব থেকে কোনো মুক্তি নেই, বরং সে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে (৮:৪১৩-৪১৪)! ৮:২৮১নং শ্লোকে আছে শূদ্র যদি কখনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসে তবে শূদ্রের কটিদেশে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে নির্বাসন দেয়া হবে! অপরাধী বিচারের ক্ষেত্রে ছিল চরম বৈষম্য, শূদ্র ব্রাহ্মণপত্নীগমন করলে শাস্তি ছিল মৃত্যু (৮:৩৩৬); পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীকে বলৎকার করলেও শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড মাত্র (৮:৩৮৫)। ব্রাহ্মণকে চোর বলে গালি দিলে শূদ্রের শাস্তি প্রাণদণ্ড, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড (৮:৬৭-৬৮)। আসলে গোটা মনুসংহিতা জুড়েই রয়েছে শূদ্র নিষ্পেষণ, নিপীড়নের বাণী; তাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার স্বীকার করা হয়নি এ গ্রন্থে। বলা যায় মনুসংহিতা হচ্ছে 'শূদ্র নিপীড়নসংহিতা'!

এবার আরো কিছু ধর্মগ্রন্থ থেকে শূদ্রের অবস্থান দেখা যাক : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে (৭/৩৫/৩), শূদ্রকে ইচ্ছা করলে উচ্চবর্ণীয়রা তাঁর বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে, বাধা দিলে হত্যা করার বিধান রয়েছে; যজ্ঞকালে শূদ্ররা নিষিদ্ধ ব্যক্তি বলে গণ্য হবে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩/১/১/৯); শূদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র পঠন তো দূরের কথা শ্রবণও নিষিদ্ধ (গৌতম ধর্মসূত্র, ১৬:১৯); শূদ্র যদি বিপন্ন হয়েও উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে কথা বলেন, কিংবা তাঁর মুখের দিকে তাকান, তাহলে শাস্তি ছিল জীবন্ত পুড়িয়ে মারা (গৌতম ধর্মসূত্র, ২/২/৩/৩৩)। ব্রাহ্মণ যদি কোনো শূদ্রাণীকে বৈধভাবে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলেও সেই মহিলার গর্ভজ সন্তান পিতৃসম্পত্তির অংশ পাবে না। শুধুমাত্র তার ভরণপোষণের খরচটুকু দেবে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা, যারা উচ্চবর্ণীয় নারীর গর্ভজাত (গৌতম ধর্মসূত্র, ২৮:৩৭); কোনো দাস/শূদ্র তাঁর প্রভুর অন্যায় বা অনাচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে না (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ৩:১)।

সম্ভবত আর উদাহরণ অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন! এই তালিকা ভাসমান 'সামাজিক অনাচারের'

হিমশৈলের শীর্ষাংশ মাত্র! এ রকমের শতশত বিধান ঈশ্বরের বাণী হিসেবে প্রচার করে প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গ আর পুরোহিত শ্রেণী সমাজ জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিলো; সমাজপতিরা নির্দ্বিধায় তথাকথিত ধর্মবিধানের দোহাই পেড়ে সমাজের বৃহত্তমসংখ্যক মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য মানবিক অধিকার (মর্যাদা তো পরের কথা) থেকে বঞ্চিত করেছেন, লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই সকল অপহ্নবকের পক্ষে সাফাই গেয়ে, বর্ণভেদ প্রথার গুরুতর আর্থ-সামাজিক অসাম্যকে ঐশ্বরীয় সমর্থন দেবার উদ্দেশ্যে গীতায় শ্রীভগবান (৪:১৩) বলেন, "চাতুর্বর্ণ্যয়ং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।/তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥"। অর্থাৎ, গুণ অনুযায়ী কর্মের বিভাগ অনুসারে আমার দ্বারা চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে তার কর্তা এবং অব্যয় অকর্তা রূপে জানবে। শূদ্রদের জন্য এতো অন্যায় রীতিনীতি-নির্দেশ ভগবান নিজের সৃষ্টি বলে সাফাই গেলেন! ভগবান আগেই জানিয়েছেন (গীতা, ৪:১), গীতার তত্ত্ব তিনি আগেই সূর্যকে বলেছিলেন, সূর্য মনুকে, মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে বলেছিলেন।

ভগবান ভগবদ্গীতায় আরও বলেন (১৪:১৮), "ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।/ জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥" অর্থাৎ, সত্ত্বগুণের অধিকারীরা ঊর্ধ্বে যায়, রজঃগুণসম্পন্নরা মধ্যে অবস্থান করে, আর তমগুণসম্পন্ন লোকেরা জঘন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে অধোগামী হয়। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে সত্ত্বগুণের অধিকারী কারা, রজঃ বা তমোগুণসম্পন্ন কারা? মনুসংহিতায় রয়েছে সত্ত্বগুণজাত হচ্ছে ব্রহ্মা, বিশ্বস্রষ্টাগণ যজ্ঞকারী, ঋষি, দেবতা, বেদ তপস্বী, সন্নাসী, ব্রাহ্মণ প্রমুখ (মনুসংহিতা, ১২:৪৮-৫০); রাজা, ক্ষত্রিয়, যক্ষ, দেবগণের অনুগামী, অস্ত্রজীবী লোক প্রমুখ রজোগুণসম্পন্ন; আর হাতি, ঘোড়া, শূকর, শূদ্র, নিন্দিত ম্লেচ্ছ, সিংহ, বাঘ, ধর্মাচরণকারী, রাক্ষস, পিশাচ হচ্ছে তমোগুণজাত (১২:৪৩-৪৪)। এ বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ নেই, যে ভগবদ্গীতার ১৪তম অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকের এই উক্তির মাধ্যমে আর্যসমাজ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোয় ব্রাহ্মণ্যদের উচ্চস্থান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যস্থান আর শূদ্রের নিম্নস্থানের ইঙ্গিত করা হচ্ছে। ভগবান, যিনি সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন বলে দাবি করেন, তিনি গীতায় বলে উঠেন (১৭:১০) : "যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।/উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥"; বাংলায়, বহুদিনের পূর্বের বাসী, রসশূণ্য, দুর্গন্ধযুক্ত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্য তমোগুণ সম্পন্ন লোকের প্রিয়। এরকম খাবার তথাকথিত তামস প্রকৃতির শুদ্রলোকেরা ভালোবেসে খায় না! বাসী, নিরস, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাবার তারা দারিদ্রের পীড়নে খেতে বাধ্য হয়। বাসী-নিরস-উচ্ছিষ্ট খাবার কারো-ই বা খেতে ভালো লাগে? শ্রীভগবান নিকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণকেই শূদ্রদের স্বভাবজ তমগুণের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণ চিন্তা থেকেই বোঝা যায়, তৎকালীন যুগের অমানবিক আর্থসামাজিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই চাতুর্বর্ণ প্রথাটি 'ভগবানের' নামে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা (ক্ষত্রিয়দের যোগসাজশে) চালিয়েছেন। ভগবানের দোহাই দিয়ে, ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি করে, দারিদ্র, ক্লিষ্ট, অনাহারী মানুষেরা (শূদ্ররা) যেন

তাদের (ব্রাহ্মণ্যদের) ক্ষমতার প্রতি অফুরন্ত লিপ্সা মিটিয়ে চলে বিনা প্রশ্নে, বিনা বাধায়।

পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রাচীনকালে শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে এক ধরনের আদিম শ্রেণীবিভাগভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। এই শ্রমবিভাজনভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী সময়-সুযোগ পেলে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বিদ্রোহ করেছে। এখান থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর মানবমুক্তির বীজ বপিত হয়েছে; যেমন প্রাচীন চীন দেশে বারবার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে, রাজশক্তি বা শোষকগোষ্ঠী বারবার প্রতিহিত হয়েছে। গ্রিক সাম্রাজ্যে, রোমান সাম্রাজ্যে বারবার দাস বিদ্রোহ হয়েছে। এমন কী ১৭৮৬-১৭৯৫ সাল ব্যাপী সংঘটিত ফরাসি বিপ্লব পৃথিবীর গণমানুষের চেতনায় মোড় ঘুড়িয়ে দিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এরকম শ্রমিকশ্রেণীর জেগে উঠার নজির ইতিহাসে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না (মৌর্যযুগের শেষের শূদ্রবিদ্রোহ বাদে)। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে ধর্ম নামক আফিম। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এরকম শ্রেণীবিভাগের কাঠামোকে ধর্মীয় আবরণে বংশানুক্রমিক ও চিরস্থায়ী করার রীতি ছিল না কিংবা সম্ভবও হয়নি। ভারতবর্ষেই একমাত্র মনুসংহিতা-গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদের দোহাই দিয়ে নির্যাতিত শ্রমিকশ্রেণীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আমজনতাকে বেঁধে ফেলে 'ধর্ম' নামক আফিমে। 'পৌরাণিক ঐতিহ্যে'র নামে গলাধঃকরণ করিয়ে গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীর স্বার্থে দাস হিসেবে রাখাই ছিল শাস্ত্রকারকদের মূল লক্ষ্য। ধর্মের নামে সামাজিক শোষণ আর নিপীড়নের এতো দীর্ঘস্থায়ীরূপ দেখে বলা যায়, তারা সফল হয়েছিল!

ভগবদ্‌গীতা ব্রাহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব কাঠামো, শাসন-শোষণ, চাতুর্বর্ণ প্রথা টিকিয়ে রাখার জন্য সুদীর্ঘ সময় ধরে সুকৌশলে রচিত। এটি কোনো দেবতার মুখঃনিসৃত বাণী নয়; নয় অলৌকিক কিছু। স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্ব যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ। গীতা কোনো বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়। হতে পারে, প্রাচীন সাহিত্য হিসেবে এর ঐতিহাসিক একটা মূল্য রয়েছে, কিন্তু আজকের যুগে গণমানুষের কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চায়-প্রসারে এটি এখন অচল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৯৭, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা।

(২) শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ গিরি মহারাজ (সম্পাদিত), ২০০৫, *শ্রীগীতা*, চন্ডিমুড়া, কুমিল্লা।

(৩) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), ২০০২, *মনুসংহিতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

(৪) জয়ন্তানুজ বন্ধোপাধ্যায়, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪), *সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা*, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

(৫) শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩), *জীবন আসে জীবন থেকে*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, পশ্চিমবঙ্গ।

(৬) শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ২০০১, *কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, পশ্চিমবঙ্গ।

(৭) জয়ন্তানুজ বন্ধোপাধ্যায়, ১৯৯৬ (প্রথম সংস্করণ ১৯৯০), *মহাকাব্য ও মৌলবাদ*, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

(৮) ড. আর. এম. দেবনাথ, ২০০৫ (প্রথম সংস্করণ ২০০১), *সিন্ধু থেকে হিন্দু*, রিডার্স ওয়েজ, ঢাকা।

(৯) ভবানীপ্রসাদ সাহু, ২০০১, *ধর্মের উৎস সন্ধানে*, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

(১০) পল্লব সেনগুপ্ত, ১৯৯৯, *ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা : উৎসের সন্ধানে*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা।

(১১) মনিরুল ইসলাম, ২০০৮, *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার*, ক্যাথার্সিস পাবলিশিং, ঢাকা।

(১২) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.iskcon.com/worldwide/centres/asia.html

(১৩) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.solarviews.com/eng/sun.html

(১৪) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_5.html

ঈশ্বর ও ধর্ম প্রসঙ্গ : সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ ধর্মবিশ্বাসকে ধারণ করে আসছে। প্রথম দিকে তা ছিল অসংগঠিত; কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস ও তার আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ধর্ম সংগঠিত হতে শুরু করে এবং জটিল আকার ধারণ করে। আধুনিক যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম দেখা যায়। যেমন-ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ, জুডাইজম (ইহুদিদের ধর্ম), বাহাই ইত্যাদি। আবার বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার একটা বড় অংশই ধর্মহীন।

বিশ্বাস বনাম যুক্তি

ধর্মগুলোর প্রধান শর্ত ও একমাত্র অবলম্বন 'বিশ্বাস'। ধর্মগুলোকে কখনো যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, যদিও প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ ধর্মের অনুকূলে অনেক যুক্তির অবতারণা করে; তবে তা কখনও যথার্থ যুক্তি হয়ে ওঠেনি। ধর্মগুলোকে প্রমাণ করা যায় না বলেই হয়ত তা ধর্ম, নইলে তা পরিণত হত বিজ্ঞানে। প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস, যুক্তি নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেউ যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে কিনা তা ধর্মের কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। যুক্তির সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক ঠিক যেন পরস্পর বিপরীতমুখী; কেননা বিশ্বাসের প্রশ্ন তখনই আসে যখন তার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ সম্ভব হয় না। যা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন সম্ভব, তাকে বিশ্বাস করার জন্য কেউ বলবে না। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিজ্ঞানের কথা বলা যায়। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর, তাই বিজ্ঞানের কোনো বিষয় বিশ্বাস করার জন্য কাউকে আহ্বান জানানো হয় না, যেমনটি ধর্ম করে সব সময়। সত্য সত্য-ই, বিশ্বাসের জন্য নেই তার অপেক্ষা। কেবল মিথ্যাই বিশ্বাসের জন্য বসে থাকতে পারে। ধর্মগুলোর বিষয়ে আরেকটি কথা না বললেই নয়। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সকল মানুষ যদি ঠিক এ মুহূর্তে ঐ ধর্মকে অবিশ্বাস করে তবে, তাৎক্ষণিক তার বিলুপ্তি ঘটবে। তাহলে ধর্মগুলো কি শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়? একমাত্র মানুষের বিশ্বাস ব্যতীত ধর্মের আলাদা কি কোনো অস্তিত্ব আছে?

স্রষ্টায় বিশ্বাস

স্রষ্টায় বিশ্বাস ধর্মগুলোর প্রধান ভিত্তি। তবে স্রষ্টা বিষয়টি একেক ধর্মে একেক রকম। তাঁর বৈশিষ্ট্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য, এমনকি নামেও। হিন্দুরা স্রষ্টাকে বলেন ঈশ্বর কিংবা ভগবান, মুসলমানরা আল্লাহ, খ্রিস্টানরা গড, ইহুদিরা জেহোভা। বিশ্বাসীরা স্রষ্টাকে বলেন আদিকারণ (First Cause)। তারা বলেন সব ঘটনার পেছনে যেহেতু কারণ আছে তাই এ মহাবিশ্ব এবং এর যাবতীয় ঘটনার পেছনে এমন একটি বিশেষ কারণ থাকতে হবে যার আর নিজের কোনো কারণ নেই (Uncaused cause)। আর এই বিশেষ কারণকেই তারা অভিহিত করেছেন ঈশ্বর হিসেবে। বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। প্রথমেই মনে করি,

আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানি না, কেননা পূর্বসংস্কার সব সময়ই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেয়। এবার আমরা আমাদের প্রাত্যহিক ঘটনার দিকে নজর দিলে দেখতে পাই, সব কিছুর পেছনে একটা কারণ আছে। কারণ ছাড়া কিছু হয় না। আবার সেই কারণের পেছনেও একটা কারণ আছে। যাই হোক, আমরা আমাদের চিন্তার উৎস হিসেবে এ কথাটিকে নিতে পারি, 'সবকিছুর পেছনে একটা কারণ আছে'। এবার আমরা, কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরে নেই, 'সব কিছুর পেছনে একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি সবকিছুর কারণ, তার আর কোনো কারণ নেই'। এবার আমাদের চিন্তার উৎসের দিকে নজর দেয়া যাক—'সব কিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' তা আমাদের চিন্তার এই ফলাফল—'সব কিছুর মূল কারণ ঈশ্বর, তার কোনো কারণ নেই' এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও বিপরীতমুখী। আমাদের চিন্তার উৎস যেহেতু 'সবকিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' তাই ঈশ্বরের পেছনে কোনো কারণ থাকবে না তা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বলেন : "If everything must have a cause, then God must have a cause"। অর্থাৎ সবকিছুর পেছনে যদি একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় তবে তিনি আল্লাহ বা ঈশ্বর যাই হোন না কেন, তার পেছনেও একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে।

বিশ্বাসীরা আসলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে চান : "ঈশ্বর ছাড়া সব কিছুর পিছনে কারণ আছে।" কিভাবে বুঝব যে এটি স্বতঃসিদ্ধ? কারণ ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব যখন বিশ্বাসীরা স্বীকার করে নিয়েছেনই, তখন 'ঈশ্বর' পর্যন্ত যাওয়া কেন? বিশ্বজগতে এসেই বা আমরা থেমে যাই না কেন? এ দাবিটি আমাদের সামনে উত্থাপন করেছিলেন ডেভিড হিউম ১৯৪৭ সালে তাঁর Dialogues Concerning Natural Religion রচনায় :

> 'But if we stop, and go no farther, why go so far? Why not stop at the material world? ...By supposing it to contain the principle of its order within itself, we really assert it to be god; and the sooner we arrive at that Divine Being, so much the better. When you go one step beyond the mundane system, you only excite an inquisitive humor, which it is impossible ever to satisfy.' (দ্রষ্টব্য : David Hume, *Dialogues Concerning Natural Religion*, ed. Norman Kemp Smith, Indianapolis: Bobbs-Merril, 1947, pp. 161-62)।

ডেভিড হিউম যখন এ কথাগুলো বলেছিলেন, তখনো আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ফলাফলগুলো জানা যায় নি। আজ যখন আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ফলাফলগুলো আমাদের চোখের সামনে আসতে শুরু করেছে, তখন দেখছি আধুনিক বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বেই

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উৎপত্তির কথা বলা হচ্ছে। পাঠকরা এ সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা লাভ করতে চাইলে অভিজিৎ রায়ের *আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী* বইটি পড়ে দেখতে পারেন। (অভিজিৎ রায়, *আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী*, অংকুর প্রকাশনী, ২০০৫)। উক্ত বইয়ের শেষ অধ্যায়ে অভিজিৎ রায় কোয়ান্টাম দোদুল্যমানতা (quantum fluctuation) প্রক্রিয়ায় কিভাবে জড় কণিকা তৈরি হয়, তার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার 'ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' গ্রন্থে স্ফীতিতত্ত্বের জনক এলেন গুথের উদ্ধৃতি দিয়ে মহাবিশ্বকে 'আল্টিমেট ফ্রি লাঞ্চ' বলে অভিহিত করেছেন। হিউম যে কথাটি অনেক আগে বলেছিলেন, আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সেটিই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। কোয়ান্টাম দোদুল্যমানতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবেই শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারলে ঈশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দরকার কি?

আদিকারণের বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আদিকারণ যে এক ও অদ্বিতীয় তার যুক্তি কী? এমনও কি হতে পারে না, আসলে আদিকারণ একটি নয়, একাধিক। এ প্রসঙ্গে ইসলামের একমাত্র যুক্তি হল, 'আসমান ও জমিনে যদি আল্লাহ ব্যতীত একাধিক ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ২২)

এবার আমরা যদি মানুষের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই একাধিক মানুষ মিলে সাধারণত একজন থেকে অধিকতর ভাল ও সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারে। বর্তমান যুগে অনেক কিছুই বহু মালিকানাধীন, যা নিয়ে দ্বন্ধ খুব কমই হয়। তাহলে স্রষ্টার ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? স্রষ্টা কি অন্তত মানুষের চেয়ে উত্তম নন? একজনের বেশি হলেই তারা কেন মধ্যযুগীয় রাজার মত একজনের ওপর আরেকজন প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করবেন অথবা পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি ধ্বংসে মেতে উঠবেন, তা বোধগম্য নয়। এছাড়া তারা একেকজন যদি নিজের মত করে একেকটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন তাতেই বা বাধা কে দিবে? আবার তারা সকলে মিলে সবার মতানুসারে একটি মহাবিশ্ব তৈরি করলেই বা সমস্যা কোথায়? এছাড়া তাদেরকে যে একটা কিছু তৈরি করতেই হবে এমনও তো নয়। তাই একত্ববাদের যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তা ভেবে দেখতে হবে।

ইবনে ওয়ারাক তাঁর 'Why I am Not a Muslim' গ্রন্থে হালকা রসিকতা করে বলেন, পলিথিইজম (বহুঈশ্বরবাদ) থেকে মনোথিইজমে (একেশ্বরবাদ) আসতে যেমন বহু 'গড'-কে ছেঁটে ফেলা হয়েছে তেমনি কালের পরিক্রমায় মনোথিইজম থেকে এথিজমে (নিরীশ্বরবাদ) উত্তরণের জন্য ভবিষ্যতে বাকি একটি 'গড'-কেও ছেঁটে ফেলা হবে। (দ্রষ্টব্য : Ibn Warraq, *Why I Am Not a Muslim*, Prometheus Books, 1995) ।

উদ্দেশ্যবাদীরা বলে থাকেন, স্রষ্টা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার মানুষ তৈরির উদ্দেশ্য একেক ধর্মে একেক রকম। কোরানে বলা হয়েছে : 'জিন ও মানুষ জাতিকে আমি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' (৫১: ৫৬)।

এখানে প্রশ্ন এসে যায়, স্রষ্টার তো কোনো অভাববোধ থাকতে পারে না এবং ইবাদতেরও তার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে কেন মানুষকে ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করলেন? বর্তমানে লব্ধ জ্ঞানে আমরা জানি মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী একটি বিন্দুসম। আর এই পৃথিবীতে যে মানুষগুলো আছে তা নিশ্চয়ই স্রষ্টার জন্য বড় একটা ব্যাপার হতে পারে না। আধুনিক যুগের পূর্বে সামান্য কিছু মানুষ ব্যতীত সকল মানুষই ছিল নিরক্ষর। আধুনিক যুগেও এসে মানুষকে সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করা যাচ্ছে না। সেই মানুষগুলোকে স্রষ্টা কেনই বা এত উচ্চাশার সাথে তৈরি করলেন। মানুষের চেয়ে উন্নততর কোনো প্রাণী নেই বিধায় আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা আঁচ করতে না পেরে নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান মনে করতে থাকি। তাই হয়ত কল্পনা করি যে, অসীম জ্ঞানী স্রষ্টা আমাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হবেন না তো কী!

এখানে আরেকটি কথা, ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য কি পূরণ হয়েছে? ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় কখনো মুসলমানদের সংখ্যা অমুসলিমদের চেয়ে বেশি হয় নাই। এছাড়া মানুষ সাধারণত ধর্মের দৃষ্টিতে যতটা না সৎকাজ করে তার তুলনায় অসৎ কাজ করে ঢের বেশি। এবার কেউ হয়ত বলতে পারেন স্রষ্টা আমাদেরকে পৃথিবীতে পরীক্ষা করছেন। তাহলে বলব, পরীক্ষার ফল কি হল? তিনি কেন তুচ্ছ মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এটা কি তার পবিত্রতার বরখেলাপ নয়? যেহেতু সকল ধর্ম মতেই স্রষ্টা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাই আপত্তিটি কিছুটা পরিবর্তিতরূপে সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই উত্থাপন করা যায়।

অনেকে আবার স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মহাবিশ্বের শৃঙ্খলার দোহাই দেন। এ বিষয়ে নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়াইনবার্গ বলেন, 'যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোনো মূর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

অনেকে এমনও বলেন, স্রষ্টাকে আপনি বুঝবেন না। স্রষ্টাকে যদি নাইবা বুঝি তবে তাকে বিশ্বাস করব কিভাবে? যেখানে একেক ধর্মে একেক ধরনের স্রষ্টা; এছাড়া তার অস্তিত্বের ধারণার বিরোধিতা অনেকেই করেছেন। আর আমরা স্রষ্টাকে না বুঝলে তিনি যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন বলা হয়, তা পূর্ণ হবেই বা কিভাবে? অবশ্য স্রষ্টা বিষয়টি মানুষের যদি অবোধগম্য হয়, তবে তা নিয়ে মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই। কেননা তাহলে তিনি অবশ্যই মানুষকে তাঁর আরাধনা বা স্তুতির জন্য নয়, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এটি অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের (Deist) বিশ্বাস। যদিও এই অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের পেছনেও কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি-প্রমাণ নেই, তবে তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তেমন কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না, বিধায় হয়ত তা মন্দ নয়। (ধরা যাক, ঈশ্বর আছেন। এখন তিনি যদি মহাবিশ্বের সাথে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন তবে কী হবে? অনেকের রেডিমেইড উত্তর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে বা বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক কার নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস

হবে বা বিলীন হবে? শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য যে মহাবিশ্ব যেভাবে চলছে তেমনি তার আপন গতিতে চলতে থাকবে। এটা অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের (Deist) পক্ষে যায়)। আমরা সাধারণত বলে থাকি স্রষ্টাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা বেমালুম ভুলে যাই যে, আমরা নর ও নারীর (পিতা-মাতা) মাধ্যমে জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের জন্ম সম্পূণই তাদের (পিতা-মাতা) ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল।

প্রতিটি ধর্মেই ঈশ্বরের ধারণা অত্যন্ত অদ্ভুত। ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ রয়েছে। যেমন তিনি খুশি হন, রাগ করেন, দেখেন, শোনেন, বুঝেন। বলা হয় তিনি নিরাকার। আবার তাঁর নূর বা জ্যোতি রয়েছে! এছাড়া তাঁর দুটি গুণ অসীম দয়ালু ও ন্যায়বিচারক পরস্পরবিরোধী। যিনি ন্যায়বিচারক, তিনি দয়ালু হন কিভাবে আর যিনি দয়ালু, তিনি ন্যায়বিচারক হন কিভাবে? ঈশ্বরের করুণা, দয়া, ক্ষমতা অসীম। কিন্তু অসীম দয়া, করুণা বা ক্ষমতা বলতে আসলে কী বুঝায়? আর মহান ঈশ্বরের নির্দেশে যখন জলোচ্ছ্বাস বা সিডরের মত ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তখনো বলতে হবে ঈশ্বর করুণাময়, অসীম দয়ালু। স্রষ্টাকে বলা হয় তিনি অসীম ক্ষমতাবান। তাহলে তিনি কি এমন কিছু তৈরি করতে পারবেন যা তিনি নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। প্রশ্নটির উত্তর হ্যাঁ বা না যেটিই হোক তা ঈশ্বরের অক্ষমতা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। ঈশ্বর স্তুতিপ্রিয়, তিনি নিজে নিজেই চমৎকার সব গুণবাচক নাম ধারণ করেন যা অনুসারীদের বাধ্যতামূলকভাবে জপ করতে হয়। এছাড়া তার রয়েছে সিংহাসন (আরশ)। ঈশ্বরকে বলা হয় অসীম আবার তাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। কোনো কোনো ধর্মে ঈশ্বরকে বলা হয় নিরাকার। নিরাকার অথচ সচেতন সত্তা, তার ক্ষমতা ও অসীম। তা সত্ত্বেও তার বসার জন্য প্রয়োজন কুরসি বা চেয়ার বা আরশ বা রাজসিংহাসন। আবার তিনি সর্বব্যাপী। একেই বোধহয় বলে 'বিল্ডিং এ কাসল ইন দা এয়ার'। যেহেতু নিরাকার কোনো সচেতন সত্তা আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই এবং অসম্ভব, তাই নিরাকার ঈশ্বরের ধারণার কোনো দার্শনিক বৈধতা নেই। এছাড়া স্রষ্টা বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, স্রষ্টার কি এমন কোন গুণ রয়েছে যা সীমিতভাবে মানুষের মধ্যে নেই? এতে বিষয়টি পরিষ্কার, মানুষের পক্ষে স্রষ্টার ও তার গুণাবলীর কল্পনা সম্ভব এবং মানুষ তা-ই করেছে।

ঈশ্বর আছেন মানেই আমার নিজ ধর্ম সত্য, এমন ধারণা অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসীর। ঈশ্বর থাকা আর কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের সঠিক হওয়ার মধ্যে যে একটা বিরাট ব্যবধান আছে তা ধর্মবাদীরা এক লাফে পাড়ি দিয়ে চলে আসেন। আরেক দল আছেন যারা মনে করেন ঈশ্বর আছেন সুতরাং তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু যোগাযোগ বলতে হুমকি-সর্বস্ব কিছু ধর্মীয় বাণী ছাড়া আর কিছুই তারা দেখাতে পারেন না। 'ঈশ্বর আছেন বলেই তিনি মানুষের সাথে যোগাযোগ করবেন'-এই কথাটিকে যদি আমরা বিবেচনায় আনি তবে এটাই বরং পরিষ্কার হয়ে যায় ঈশ্বরের গুণাবলি মানুষের আরোপিত। কেননা ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই

ঠিকমত না জেনে 'ঈশ্বর অবশ্যই মানুষের সাথে যোগাযোগ করবেন'-এই ধারণা পোষণ এ ধরনেরই ঈঙ্গিত দেয়। এখানে আরো সমস্যা রয়েছে। ঈশ্বর যদি মানুষের সাথে যোগাযোগ করবেন তাতে সমস্যা কোথায়? কেন তিনি চুপিচুপি দুয়েকজনের সাথে শুধু যোগাযোগ করবেন? কেন ধর্মগ্রন্থের অলৌকিকতার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে না? কেন ধর্মগ্রন্থকে পড়তে সেকেলে মনে হবে? কেন নবী-রসুলদের ব্যাপারে সন্দেহ-অবিশ্বাসের উদ্রেক হয়?

ঈশ্বর নামক কারো অস্তিত্ব থাকলেই সে ভাল, উত্তম, দয়ালু, উপাসনার যোগ্য ইত্যাদি হয়ে যায় না। এমনও কী হতে পারে না-ঈশ্বর মন্দ, নির্দয়, উপাসনার অযোগ্য। যিনি মানুষকে অনন্তকাল আগুনে পোড়ানোর শাস্তি দিতে পারেন তাকে আর যা হোক শুভ কিছু বলে মানতে আমাদের আপত্তি আছে। এমনও তো হতে পারে ঈশ্বর এমন সব গুণ (ভাল বা মন্দ) থেকে মুক্ত। সবচেয়ে বড় কথা- ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবি যেহেতু ঈশ্বরবাদীরাই করেন তাই ঈশ্বরকে বোধগম্য করে তোলা, সংজ্ঞায়িত করা এবং প্রমাণ করা তাদেরই দায়িত্ব। তারা যদি এতে ব্যর্থ হোন তবে কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়ার কোনই গ্রহণযোগ্য কারণ থাকল না। যা জানি না তা সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট বলে দেয়া উচিত 'উহা জানি না' এবং এখানে ঈশ্বরকে নিয়ে এসে অহেতুক জঞ্জাল সৃষ্টি বন্ধ করার কোনো বিকল্প নেই।

ধর্ম প্রসঙ্গ

আধুনিক পৃথিবীতে ধর্মের ছড়াছড়ি। এই ধর্মগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে বিপুল সাদৃশ্য, তেমনি বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও সরল আলোচনায় আসা যাক।

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বর্গ, পৃথিবী, জীবজগৎ ও বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তারপর তিনি অ্যাডাম ও ইভ নামক প্রথম মানব-মানবীকে মাটি থেকে তৈরি করে প্রাণ দেন। সৃষ্টি মুহূর্তে পৃথিবী ছিল আকারহীন ও শূন্য এবং মহাঅন্ধকারে নিমজ্জিত। বিশ্ব মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে ধ্বংস হবে আর ঐ দিনই ঈশ্বর সকলের কৃতকর্মের বিচার করবেন।

বাইবেল গ্রন্থটি স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। নীচে বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি দেয়া হল :

১। মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো। (জেনেসিস ১:১১-১২)। মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১:৭-৯)।

২। জন্তু-জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো। (জেনেসিস ১:২৫-২৬)। জন্তু-জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ২: ১৮-২০)।

৩। আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে। (জেনেসিস ২:১৭)। আদম ৯৩০ বছর বেঁচেছিল (জেনেসিস ৫: ৫)।

৪। ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না। (জেমস ১:১৩)। ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান। (জেনেসিস ২২:১/২, স্যামুয়েল ২৪:১)।

৫। কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখে নি বা দেখতে পারে না। (জন ১:১৮/১, টিম ৬:১৬)। অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন। (জেনেসিস ২৬:২, এক্সোডাস ২৪:৯-১০, ৩৩:২২-২৩)।

৬। কেউই ঈশ্বরের মুখ দর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না। (এক্সোডাস ৩৩:২০)। জেকব ও মুসা দুজনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন কিন্তু মরেন নি। (জেনেসিস ৩২:৩০, এক্সোডাস ৩৩:১১)।

এটি শুধু মানুষ সম্পর্কিত কিছু স্ববিরোধী আয়াত। ভাল করে খুঁজলে বাইবেলে এরকম স্ববিরোধী উক্তি প্রচুর পাওয়া যায়।

বাইবেলের মতে পৃথিবী স্থির। বাইবেলের এই ধারণার কারণে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল খ্রিস্টান ধর্মপুরুষরা। কোরানেও শুনি বাইবেলের কথার প্রতিধ্বনি। কোরানের ভাষায় : "নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়।" (৩৫:৪১)। "ইহা তার নিদর্শনসমূহ আসমান-জমিন তারই হুকুমে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।" (৩০:২৫)। (দ্রষ্টব্য : বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ, মাও. ফজলুর রহমান মুন্সি)।

১৯৬৬ সালে সৌদি আরবের ধর্মগুরু শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ সৌদি বাদশাহ বরাবর চিটি লিখে আবেদন জানিয়েছিলেন পবিত্র কোরান ও মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা অনুযায়ী পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে আল্লাহ, কোরান ও মহানবী (সাঃ)-এর বিচারে কাফের হিসাবে অভিযুক্ত হবেন। অনেকে সুরা ইয়াসিনের ৪০ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চান যে কোরান নাকি বলছে পৃথিবীও ঘূর্ণনশীল। অথচ ওই আয়াতে শুধু চাঁদ ও সূর্যের ঘূর্ণনের কথা বলা হয়েছে।

সৃষ্টি সম্পর্কে কোরানের অন্যত্র বলা হয়েছে : "আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন আরশ ছিল পানির উপরে।" (১১:৭)। (উল্লেখ্য আরশ শব্দের অর্থ রাজসিংহাসন)। "আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন।" (২৪:৪৫)। কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে "সেদিন আটজন ফেরেশতা রবের আরশ বহন করবেন।" (৬৯:১৭)।

সুরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াত মতে, মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক স্ত্রী থাকলে তার সম্পত্তির ভাগ মা পাবে ১/৬, বাবা ১/৬, দুই মেয়ে ২/৩ ও স্ত্রী ১/৮ অংশ। তাহলে মোট অংশ দাঁড়ায় (১/৬+১/৬+২/৩+১/৮) = ২৭/২৪ অংশ, যা মূল পরিমাণের চেয়ে বেশি। পরে হজরত আলী তা সংশোধন করেন। যা ফরায়েজে আইনে 'আউল' নামে পরিচিত।

সুরা ফাতেহা (বিশেষত চার থেকে সাত নম্বর আয়াত পর্যন্ত) আল্লাহর বাণী হয় কিভাবে? পুরো সুরাটি পড়লে সুরাটিকে আল্লাহর কাছে অন্যের প্রার্থনা বলেই মনে হয়। আয়াতগুলোর

পূর্বে 'বল' বা 'এই বলে প্রার্থনা করো' বলা হয় নাই। সেখানে আল্লাহর কাছে সঠিক পথ দেখানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। ইবনে ওয়ারাক তাঁর Why I am Not a Muslim গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। সুরা ফাতিহা সম্পর্কে ইবনে ওয়ারাকের বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> 'These words are clearly addressed to God, in the form of prayer. They are Muhammad's words of praise to God, asking God's help and guidance.'

এছাড়া সুরা তওবা স্বতন্ত্র সুরা নাকি অন্য কোনো সুরা বা সুরা আনফালের অংশ তা নিয়ে বিভেদ আছে। সুরা ফীল ও কোরাইশ এক সুরা নাকি পৃথক দুটি সুরা তা নিয়ে অনেক বিতর্কও রয়েছে। তাছাড়া কোরানের আয়াত, শব্দ, বর্ণসংখ্যা নিয়ে বিভেদ রয়েছে, তা অনেকেই খেয়াল করেন না।

ইসলাম ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম থেকে আদম-হাওয়ার অদ্ভুত কাহিনিকে প্রায় হুবহু গ্রহণ করেছে। আল্লাহ আদমকে না-কী ৬০ হাত (প্রায় ৩০ মিটার) দৈর্ঘ্যে বানিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য : সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৭৪, নাম্বার ২৪৬ এবং ভলিউম ৪, বুক ৫৫, নাম্বার ৫৪৩)।

হাদিসে আছে আবু যর গেফারি (রা.) একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জানো? আবু যর বললেন,আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকেও এই সম্বন্ধে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। (দ্রষ্টব্য : *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, পৃষ্ঠা ১১৩৩)।

প্রশ্ন হল পৃথিবীর এক জায়গায় সূর্যাস্ত হলে অন্য জায়গায় থাকবে দুপুর, আরেক জায়গায় থাকবে সূর্যোদয়। তাহলে হাদিসে যা বলা হল, তার ব্যাখ্যা কী?

বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, হিন্দু ধর্মের মনুসংহিতায় মুণি-ঋষিরা বর্ণনা করেছেন এভাবে : "এই যে বিশ্বসংসার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছো তা ছিল গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকার জগৎ ছিল আমাদের জ্ঞানের অতীত, কোনো লক্ষণের সাহায্যে এ সম্পর্কে অনুমানের কোনো উপায় ছিল না। এই জগৎ ছিল অজ্ঞেয়, যেন সর্বতোভাবে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই প্রলয়াবস্থার পর স্বয়ম্ভূ সূক্ষ্মরূপী ভগবান পঞ্চমহাভূত প্রভৃতিতে ব্যক্ত করলেন তিনি অমিততেজা, প্রলয়াবস্থার বিনাশক রূপেই যেন আবির্ভূত হলেন।" (মনুসংহিতা ১:৬-৭)।

সৃষ্টির আদিতে কী ছিল তা ঐতিরেয় উপনিষদে বিবৃত হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ

অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এই রূপ ঈক্ষণ করিলেন-'আমি লোকসমূহ সৃজন করিব।" (ঐতিরেয় উপনিষদ, ১:১:১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত : 'পূর্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল, কারণ বুভুক্ষাই মৃত্যু। 'আমি সমনস্ক হইব'-এইরূপ উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া ঐ মৃত্যু কার্যপর্যালোচনক্ষম মনের সৃষ্টি করলেন। তিনি আপনাকে পূজা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন অর্চনারত ছিলেন, তখন উদক (জল) উৎপন্ন হইল।' (১:২:১)। 'জলই অর্ক। উক্ত স্থলে জলের উপরে সরের ন্যায় যাহা হইয়াছিল, উহা গাঢ় হইল; এবং উহা পৃথিবীতে পরিণত হইল। পৃথিবী সৃষ্টি হইলে শ্রান্ত ক্লান্ত সেই মৃত্যু থেকে তেজোরস নির্গত হইল। (ইনিই) অগ্নি অর্থাৎ বিরাট।' (১:২:২)।

উপরের এ বর্ণনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিবাণীর সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই এবং এগুলো আদিম মানুষের কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

ধর্মগুলোর মধ্যে একটি বড় সাদৃশ্য হল, সকল ধর্মই দাবি করে সেই সত্য ও সর্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য ধর্ম মিথ্যা ও নিকৃষ্ট। আবার ধর্মগুলো যেমন তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য বরাদ্দ রেখেছে স্বর্গ, তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য নরক। কিন্তু ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলে থাকেন-যত মত, তত পথ। যেখানে এক ধর্মের কাছে অন্য ধর্ম সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সেখানে কথাটিতে স্ববিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ পায় না।

সকল ধর্মই মানবতার কথা বলে -এরকম যারা বলেন তারা হয় মানবতা বোঝেন না, নয়ত ধর্ম বোঝেন না। একটি ভুল জীবনদর্শন মানুষকে শুধু প্রতারণাই দিতে পারে।

হিন্দুরা দাবি করেন তাদের ধর্ম চিরায়ত ধর্ম, সেই আদিমকাল থেকে তাদের ধর্ম চলে আসছে। তাই তাদের ধর্ম খাঁটি ও সর্বোত্তম। যদিও অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর এই ধর্মে স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার নেই এবং গোটা ধর্মটিই অনেক আদিম কুসংস্কারের আশ্রয়। হিন্দু ধর্মে আছে : 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরাধর্ম ভয়াবহোঃ"—নিজের ধর্মে বিশ্বাসী থেকে মৃত্যুবরণ করলে পুরষ্কার প্রাপ্তি, ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করলে ভয়ঙ্কর শাস্তি। বিধর্মীর জন্য রয়েছে 'রৌরব নরক'। অহিন্দু মাত্রই যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি। ইহুদিরা প্রচণ্ড ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ সেমেটিক বর্বর ধর্মীয় আইনগুলোর মূল উৎস যা থেকে খানিকটা খ্রিস্টানরা ও বিশাল পরিমাণে মুসলমানরা গ্রহণ করেছে। (যেমন ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা ইত্যাদি ইহুদিদের ধর্ম হয়েই ইসলামে এসেছে)। ইহুদিরা নিজেদের ঈশ্বরের একমাত্র মনোনীত জাতি বলে মনে করে। এ ধরনের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে সকল মানুষ আদিপাপের বোঝা নিয়ে জন্মে। সকল মানুষই ইটারনেল ডেমনেসন বা অনন্তকাল নরকভোগের উপযুক্ত, শুধু খাঁটি খ্রিস্টানরা ব্যতীত। বৌদ্ধধর্মের মূল ধারাটি নিরীশ্বরবাদী হওয়ায় অনেকে একে ধর্ম মনে করেন না, তারা মনে করেন এটি একটি দর্শন।

ইসলামে তো একবাক্যেই অন্য সব ধর্মকে নাকচ করে দেয়। কোরানে আছে, নিশ্চয়ই

আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম (৩:১৯)। ইসলাম মতে, মুসলমানরা মৃত্যুর পরে (পাপ মোচনের পর) চিরদিনের জন্য বেহেশতে যাবে আর অবিশ্বাসীরা চিরদিনের জন্য দোজখে যাবে। (২:৩৯)।

আমরা যদি মানুষের ধর্মবিশ্বাসের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করি তবে দেখতে পাই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রায় সকল মানুষের ধর্মবিশ্বাস তার পিতা-মাতা বা পরিবারের উপর নির্ভর করে। একটি শিশু যে ধর্মাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সে সচরাচর সেই ধর্মেরই হয়ে থাকে। কেননা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী পরিবার শিশু কিছুটা বড় হয়ে উঠতে না উঠতেই তাদের ধর্মে গভীরভাবে বিশ্বাসী করে তোলার জন্য তোড়জোড় শুরু করে। শিশুকে ধর্ম-বিশ্বাসী করে তোলার ক্ষেত্রে কেউই শিশুর পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। অতি অল্প বয়সেই শিশুকে পরিবারের ধর্মের বিভিন্ন অলৌকিকতার পৌরাণিক কাহিনি, স্বর্গ, নরক, মহাপুরুষের মহৎকীর্তি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অন্য ধর্ম সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড ঘৃণাও এ বয়সে শিশুর মনে তৈরি করা হয়। তাদের মনে এগুলো স্থায়ীভাবে দাগ কাটে যার ফল হিসেবে সে কখনও স্বীয় পারিবারিক ধর্মের ঊর্ধ্বে কিছুই চিন্তা করতে পারে না। তাই সে সারা জীবন ধরে তার পরিবারের ধর্মেই থাকে, এমনকি তার ধর্মের এক শাখা পরিবর্তন করে অন্য শাখায়ও যায় না। এর অন্যথা খুবই বিরল। এছাড়া কোনো মানুষের জন্য ধর্ম ত্যাগ বা অন্য ধর্ম গ্রহণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার কেননা এতে পরিবার ও সমাজের সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ সাধারণ মানুষই ধর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে বা বুঝতে অক্ষম। যারা স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর (সমাজের বেশিরভাগ লোক) তাদের সে সুযোগই নেই। আমরা আজ থেকে দুয়েকশ' বছর পূর্বের কথা চিন্তা করলে দেখি অল্পকিছু মানুষ ছাড়া সকলেই নিরক্ষর এবং অতিমাত্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সুতরাং হাজার বছরের আগে যেসব ধর্ম প্রচারিত হয়েছে, আর যারা তা গ্রহণ করেছে, তারা কতটা সচেতনভাবে তা করেছে তা সত্যিই ভাবনার বিষয়। সভ্যতার ইতিহাসের মহাজ্ঞানী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের (ব্যতিক্রমী দুই-একজন বাদে) কেউ যেখানে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে কথিত কোনো নির্দিষ্ট সত্য-ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, সেখানে সাধারণ মানুষের যাদের চিন্তা করা, জানা-বোঝা, বিশ্লেষণের সীমা একেবারেই সীমাবদ্ধ তাদের ক্ষেত্রে এরকম আশা করা অবান্তর। অতি সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া সকলেই যেখানে নিজ-নিজ ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেই খুব স্বল্প জ্ঞান রাখে সেখানে তাদের পক্ষে অন্য ধর্ম সম্পর্কে খুব একটা জানার বা চিন্তা করার প্রশ্নই উঠে না। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে একটি মুসলিম পরিবারের সন্তান স্বভাবতই মুসলিম হচ্ছে এবং তদ্রুপ অমুসলিম পরিবারের সন্তান অমুসলিম হচ্ছে। জন্মের আগে বা জন্ম নিয়ে কেউ কোনো পাপ করেনি। তবে কেন একজন মুসলমান শুধুমাত্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে মুসলিম হওয়ায় মৃত্যুর পরে চিরকালের জন্য বেহেশতে যাবে আর একজন অমুসলিম শুধুমাত্র অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে অমুসলিম হওয়ায় চিরদিনের জন্য দোজখে যাবে? জন্মই যেসব ক্ষেত্রে ধর্ম ঠিক

করে দিচ্ছে সেখানে চিরকাল বেহেশত ও দোজখ ব্যাপারটি কি অযৌক্তিক হয়ে যায় না? প্রশ্নটি কিন্তু কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে সকল ধর্মের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। আর, মানুষের ধর্মগ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে আমরা অতি সহজে ধর্মগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে পারি।

ধর্মগুলো বিশ্বাস নির্ভর। বিশ্বাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যুক্তিবোধের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে না। ধর্মগুলো 'বিশ্বাস' মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। মুসলিম কেউ যদি ধর্মত্যাগ করে তবে তাকে মুরতাদ বলা হয় আর মুরতাদের শাস্তি শিরচ্ছেদ (শরিয়া আইন অনুযায়ী)। কোনো অমুসলিম যদি মুসলিম হওয়ার পর তার আগের ধর্মে ফিরে যায় অথবা কোনো মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কেউ বাল্যকালেই অমুসলিম হয় তবুও সে মুরতাদ এবং শাস্তির বিধান একই। সকল ধর্মই তাদের ধর্মত্যাগীদের বেলায় অত্যন্ত কঠোর। মানুষ কখনো অগ্নিকে, কখনো সূর্যকে, কখনো সাপ, কখনো গরু, কখনো ভূমি, কখনো পাথর, এমনকি কখনো গাছকেও দেবতা বলে মনে করে। পূজা করে। অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস ও আরাধনায় মানুষ তার জীবন উৎসর্গ করে দেয়। মানুষের এই 'বিশ্বাসটির' জন্য ধর্ম তবে এত লালায়িত কেন? যে মানুষ 'গরু'র পূজা করতে পারে সে স্রষ্টার পূজা করলে স্রষ্টার গৌরব কতটা বৃদ্ধি পায় তা ভেবে দেখার বিষয়।

ধর্মগুলিতে পরলোকের বৈচিত্র্যময় বর্ণনা পাওয়া যায়। ইসলামে রয়েছে শিঙ্গার ফুঁকে কেয়ামত হয়ে যাওয়া, সূর্য মাথার এক হাত উপরে আসা, স্রষ্টার হাতে পাপ-পূণ্য পরিমাপের জন্য দাড়িপাল্লা নেয়া, পুলসিরাত ইত্যাদির ধারণা। অনেকে মনে করেন 'শয়তানের' ধারণার মত পুলসিরাতের ধারণাও ইসলাম জরথুস্ত্রবাদ থেকে পেয়েছে। স্বর্গ ও নরক নিয়ে একটু ভাবলেই আঁচ করা যায় যে, এর ধারণা 'সময় ও স্থানীয়তার' উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন গ্রিকদের কাছে সাগরের বিশাল তীর দিয়ে প্রসারিত শ্যামল প্রান্তর খুবই আকর্ষণীয় ছিলো— বিশেষ করে যখন সূর্যের কিরণ তাতে বিচ্ছুরিত হত। তাই তাদের স্বর্গ অনন্ত বসন্তের হাওয়া বিরাজিত, কোমল ভাবে অনন্ত কিরণ ধারা প্রবাহিত মহা প্রান্তর। হিন্দুদের মাতৃভূমি নদীমাতৃক ফল-ফুলে শোভিত। তাই তাদের স্বর্গে রয়েছে অব্যাহত শান্তি, মন্দাকিনী কলনাদে প্রবাহিত, কুসুম ধারে ধারে প্রস্ফুটিত, অপ্সরা গীতি-কাকলি মুখরিত মঞ্জুরিবীথিকায় অপূর্ব নর্তনে ক্রীড়ারত। যিশুর সময় পৃথিবীতে ছিল রাজশক্তির প্রবল প্রভাব। তাই তার স্বর্গ একটি আর্দশ রাজ্য যেখানে ঈশ্বর জ্যোতির্ময় আসনে উপবিষ্ট আর দেবদূতেরা তার স্তুতিতে মুখর। স্বর্গে অমৃতের নদী প্রবাহিত ও তা অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত। দেড়হাজার বছর আগে আরবে ছিল ব্যাপক মদ্যপানের প্রচলন। গনগনে রৌদ্রের মধ্যে মরুভূমিতে সব সময় সুশীতল পানি ছিল অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই ইসলামের স্বর্গে রয়েছে সুশীতল পানির নহর এবং পবিত্র মদ (শরাবান তাহুরা)। মরুভূমিতে জনজীবন প্রচণ্ড তাপমাত্রায় প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই ইসলামের নরকে রয়েছে অগ্নি, প্রচণ্ড উত্তাপ। স্বর্গ-নরক তথা পরকালে এমন কিছুই পাওয়া যাবে না, যা পৃথিবীতে বসে কল্পনা করা অসম্ভব।

প্রায় সকল ধর্মে আমরা স্রষ্টার প্রেরিত পুরুষের সন্ধান পাই। তাঁদের অনেকেই মিথ বা গুজবের সৃষ্টি, কেউ ভণ্ড আবার কেউ মানসিক রোগী। অনেকে আবার এমন তপস্যায় মেতে উঠেছিলেন যে মানসিক ভারসাম্য না হারানোটাই ছিল অস্বাভাবিক। অনুসারীরা কোনো কালেই মহাপুরুষদের সমালোচনা সহ্য করেনি। ফল হিসাবে ইতিহাসে কখনো পয়গম্বরের দোষগুলো আসে না। বিশেষ করে যখন আবার পয়গম্বররা কেউ বিজয়ী রাজা হয়ে যান। ধর্মপ্রচারকদের জীবন ইতিহাস তার অনুসারীরাই তৈরি করেন বলে তারা ইতিহাসে মহানপুরুষে পরিণত হন। ধর্মবাদীরা তাদের ধর্মের মহাপুরুষদের জীবনকে ঘিরে একটা ইন্দ্রজাল তৈরিতে সদাব্যস্ত। হজরত মুহাম্মদের জীবনীকারকগণ তাঁর নিষ্পাপতা প্রমাণ করার জন্য বলে থাকেন, 'ফেরেশতারা কয়েকবার হজরতের 'সিনা সাক' বা বক্ষবিদারণ করে হৃৎপিণ্ডের জমা রক্ত যা 'শয়তানি প্রণোদনার উৎস', তা পবিত্র পানি দ্বারা ধোয়ে পরিষ্কার করেছিলেন।' ধারণাটি কষ্টকল্পিত। তখনকার সময় হয়তো ধারণা ছিল মানুষের আত্মা বক্ষস্থলে বা হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে। কিন্তু আজ আমরা জানি, মানুষের সকল ধরনের চিন্তা বা অনুভূতির আশ্রয়কেন্দ্র মস্তিষ্ক। হৃৎপিণ্ড ধোয়ে পাপ-চিন্তা সরানো অসম্ভব, এর জন্য প্রয়োজন 'ব্রেন সাক'! নৃবিজ্ঞান বলছে 'শয়তান ও ফেরেশতা' তখনকার সেমেটিকদের কল্পিত ধারণা। হজরত মুহাম্মদের জীবনযাত্রা প্রণালী মুসলমানদের কাছে অনুসরণীয়। কিন্তু শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, যুদ্ধে স্ত্রী সাথে নেয়া, পালক পুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা, চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কেটে ফেলা, ব্যাভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা এগুলোর সমর্থনে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

একজন মানুষ কিভাবে অবতার, নবী, রসুল, ঈশ্বর-পুত্র ইত্যাদি হয় তা খুবই অবোধগম্য ব্যাপার। এরা তো রক্ত-মাংসের মানুষ। তাই তারা নিজেরাইবা কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে তারা অবতার, নবী বা রসুল, তাদের সাথে দেব-দূত সাক্ষাত করেছে অন্য কিছু নয় বা এটা কোনো মানসিক বিভ্রম ছিল না ।

প্রত্যেক ধর্মের স্বতন্ত্র ধর্মশাস্ত্র রয়েছে; হিন্দুদের 'বেদ', 'গীতা', 'উপনিষদ', মুসলমানদের 'কোরান', খ্রিস্টানদের 'বাইবেল', ইহুদিদের 'তৌরাত', বৌদ্ধদের 'ত্রিপিটক', শিখদের 'গ্রন্থসাহেব'। ধর্মশাস্ত্রগুলো যেহেতু অনেক পুরোনো তাই এগুলো আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে বিরোধপূর্ণ হতেই পারে। কিন্তু বর্তমানে এগুলোকে বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য ধর্মবাদীরা গলদঘর্ম হয়ে পড়েছেন। তারা শাস্ত্রের কথাগুলোকে ইচ্ছেমত অপব্যাখ্যা করে, অর্থের পরিবর্তন করে বিজ্ঞানময় করে তুলতে চাচ্ছেন। কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসীরা ধর্মশাস্ত্রের হিজিবিজি কথার মধ্যে 'গভীর তত্ত্বের' খোঁজ পান। আবার কেউ কেউ দাবি করেন তাদের ধর্মগ্রন্থ সকল বিজ্ঞানের উৎস। কিন্তু কোনো কিছু আবিষ্কারের পরপরই তারা তা ধর্মশাস্ত্রে খোজাখুঁজি শুরু করেন এবং অল্পকাল পরে তা পেয়েও যান (!) এবং তারও কিছু পরে ধর্মশাস্ত্রের কিছু কথার ব্যাখ্যা এমনভাবে দেন যাতে মনে হয় এর আবিষ্কারক ঐ

ধর্মশাস্ত্রটিই। কিন্তু আবিষ্কার হওয়ার আগে কেন ঐ বিষয়টি ঐ ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়নি? এ বিষয়ে ধর্মবাদীরা কেন জানি নিরুত্তর। এখনো বিজ্ঞানে সবকিছু আবিষ্কার হয়নি; তাই ধর্মবাদীরা যদি দয়াপরবশ শাস্ত্র ঘাঁটাঘঁটি করে অনাবিষ্কৃত বিষয়গুলো আগেই বের করে দেন, তাহলে তাদের দাবির সত্যতা নিয়ে অনেকেরই সংশয় কমে যাবে!

ধর্মগ্রন্থ পাঠের বা পাঠ শোনার সময় ধর্মাবলম্বীদের তথাকথিত অদ্ভুত 'স্বর্গীয়' অনুভূতি হতেই পারে, কেননা ঐ ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি রয়েছে তাদের অগাধ বিশ্বাস, ভয় বা সম্ভ্রম—যা তাদের মস্তিষ্কের নিউরনগুলোকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে; এটা অলৌকিক নয়, মানসিকবিভ্রম মাত্র। ধর্মগ্রন্থগুলোতে নিত্য নতুন অলৌকিকতা আবিষ্কারে ধর্মবাদীরা খুবই পারঙ্গম—যা অজ্ঞ ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য প্রহেলিকা সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ধর্মবাদী দাবি করেনঃ— "তাদের শাস্ত্র অনুবাদ পড়ে বোঝা যাবে না"। প্রশ্ন হল, কেন? পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান মানুষ বিনিময় করেছে, অর্জন করেছে অনুবাদের মাধ্যমে, কোথাও বিশেষ কোনো সমস্যা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। হ্যাঁ, অনুবাদের সময় দুয়েকটা শব্দের বা কথার একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়, যা তখন উল্লেখ করলেই হল। যে কোনো ধর্মবিশ্বাসীদের সিংহভাগই তাদের ধর্মগ্রন্থের মূল ভাষা জানেন না, অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়। মজার কথা হল, ধর্মবিশ্বাসীরা তাদের নিজ নিজ ভাষায় যতই ধর্মশাস্ত্র চর্চা (বুঝে অথবা না-বুঝে) করে থাকেন না কেন তাতে কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু যখনই কেউ ধর্মশাস্ত্র নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন বা সন্দেহ প্রকাশ করেন ঠিক তখনই ধর্মবাদীরা এ 'ওজর' তোলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শাস্ত্রের মধ্যে কোনোই সমস্যা নেই। উহা যতক্ষণ পর্যন্ত অলৌকিক ও একদম নির্ভুল বলে মনে না হবে ততক্ষণ অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে অসীম কাল পর্যন্ত। যতক্ষণ না একে অলৌকিক বা নির্ভুল মনে হয় অথবা ভিন্ন মত থাকে ততক্ষণ নিশ্চয়ই উহা 'ঠিক মত বুঝা' হয় নি!

যদি ধর্মবাদীদের প্রশ্ন করা হয় তাদের ধর্মগ্রন্থ যে নির্ভুল, খাঁটি ও অলৌকিক তা তারা কিভাবে নিশ্চিত হলেন তবে যে সব উত্তর পাবেন তাতে শুধু আপনার বিনোদনের খোরাক যুগাবে।

ধর্মবাদীরা দাবি করেন তাদের ধর্মগ্রন্থ এমন শ্রেষ্ঠ -এর মতো কোনো গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হচ্ছে কোন দিক থেকে ধর্মগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ আর কে সেটা নিরুপণ করবেন? কোনো গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও সাহিত্যমান দ্বারাই এর মূল্যায়ন করা হয়। ধর্মগ্রন্থগুলোর সাহিত্যমানের সার্বিক মূল্যায়ন করলে তা আহামরি কিছু বলে মনে হয় না। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও শাস্ত্রগুলো এতই দুর্বল যে, বলা যেতে পারে এঁদের চেয়ে জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ যে কোনো ভাষায় অসংখ্য পাওয়া সম্ভব। এছাড়া ধর্মশাস্ত্রগুলোতে আদৌ কোনও জ্ঞান আছে কি না তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ, কেননা যেকোনো জ্ঞানের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ প্রয়োজন যা শাস্ত্রগুলো সরবরাহ করতে অক্ষম।

প্রতিটি ধর্মের নিজ নিজ তীর্থস্থান রয়েছে। এসব স্থানে ভ্রমণে ধর্মবাদীরা নিজেদের পবিত্র

করেন, পূণ্য অর্জন করেন। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রগুলোর মধ্যে চন্দ্রনাথ, লাঙ্গলবন্দ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, নবদ্বীপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রয়েছে জেরুজালেম যা মুসলমানদের কাছেও পবিত্র বটে। মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কা। প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ হাজি বিপুল অর্থ ব্যয় করে সেখানে যান। কাবাকে বলা হয় বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর আর হাজিরা আল্লাহর মেহমান বা অতিথি। কিন্তু প্রায়ই অসংখ্য হাজি তাবুতে অগ্নিকাণ্ডে বা পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। ২০০৬ সালে ৩৬০ জনের অধিক হাজি শয়তানকে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। অগ্নিদগ্ধ হয়ে বা পদপিষ্ট হয়ে মারা যাওয়া কেমন, তা একটু ভাবলেই অনুধাবন সম্ভব। আল্লাহর আতিথেয়তা সত্যিই চমৎকার!

ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাক-ইসলামি যুগে কাবার ভেতর ৩৬০টি কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি ছিল আর উৎসবের সময় তখনকার লোকেরা নাকি উলঙ্গ হয়ে এর চারদিকে ঘুরত! কিন্তু আজও হাজিরা হজে গিয়ে পরম পবিত্র জ্ঞানে কাবার চারদিকে ঘুরতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন!—কোনো সাদৃশ্য নজরে আসে কি? আরো একটি কথা—নামাজের সময় পশ্চিমদিকে (কাবারদিকে) মুখ করে নামাজ পড়তে হয়। কিন্তু পৃথিবী গোল, তাই কাবার বেশ দূরবর্তী এলাকা থেকে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া এক কথায় অসম্ভব; গ্লোব মানচিত্র দেখলে সহজে বুঝা যাবে। এটা অনেকের মাথাতেই আসে না!

ধর্মগুলোর আরেকটি ব্যাপারে মিল রয়েছে। তা হল, নারীদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা; এবং তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মমতে আদমের প্রয়োজনেই তাঁর এক বক্র হাড় থেকে 'হাওয়া' বা 'ইভে'র উৎপত্তি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতায় স্বয়ং মনু বলেছেন (৯:১৮): নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ। নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ॥ অর্থাৎ—মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোকদের সংস্কার নেই, এরা ধর্মজ্ঞ নয়, মন্ত্রহীন এবং মিথ্যার ন্যায় (অশুভ)। ইসলাম ধর্মমতে, "পুরুষ নারীর রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন" (সুরা নিসা, ৪:৩৪), "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার" (সুরা বাকারা, ২:২২৩)। বেহেশতেও নারীদের সমঅধিকার নেই। সেখানে পুরুষদের জন্য যে সত্তরজন হুরের ব্যবস্থা আছে অনুরূপ ব্যবস্থা নারীর জন্য অনুপস্থিত। বিবাহের ক্ষেত্রেও ধর্মগুলোর নীতি সম্পূর্ণই অমানবিক। ইসলাম মতে, "মুশরিক রমণী যে পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা তাকে বিয়ে করো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মবিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো" (সুরা বাকারা, ২:২২১)। অন্যান্য ধর্মগুলোতেও ভিন্ন ধর্মের কারো সাথে বিবাহ-বন্ধন গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া ধর্মগুলো পুরুষের বহুবিবাহকে অনুমোদন করেছে। এ ধরনের ব্যবস্থা একটি সভ্যসমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির দাবিদার ধর্মপ্রচারকরা পুরুষ হওয়ায়ই বিষয়টা সম্ভব হয়েছে।

প্রত্যেক ধর্ম অনেকগুলো শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। হিন্দু ধর্মে আবার অনেক কাল আগে

থেকেই বর্ণবাদ চলে আসছে। হিন্দু ধর্ম চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আবহমান কাল থেকেই নানারূপ নির্যাতন করে আসছে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। একমাত্র ব্রাহ্মণরা ব্যতীত অন্য কেউ ধর্মশাস্ত্র পাঠ করতে, এমনকি পাঠ শুনতেও পারত না। হিন্দুশাস্ত্রে মনু বলছেন (মনুসংহিতা, ৪:৮১), "যো হ্যস্য ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্। সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥" অর্থাৎ—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্মোপদেশ প্রদান করবেন, তিনি সে শূদ্রের সহিত 'অসংবৃত' নামক নরকে নিমগ্ন হবেন। খ্রিস্টানদের প্রধান প্রধান শাখাগুলো হল, রোমান ক্যাথলিক, অর্থডক্স, প্রোটেস্টান্ট, অ্যাংলিকান। এদের এক শাখার প্রচণ্ড বিরোধ রয়েছে অন্য শাখার সাথে। মুসলমানরাও বেশ কিছু শাখায় বিভক্ত; যেমনঃ সুন্নি, শিয়া, আহলে হাদিস, কাদিয়ানি। এদের মধ্যে এতই বিরোধ রয়েছে যে, কোনো কোনো শাখা অন্য শাখাকে মুসলিমই মনে করে না। প্রধান শাখা সুন্নি আবার চারটি মজহাবে বিভক্ত, যাদের মধ্যে প্রচুর মতের অমিল রয়েছে। শিয়ারাও অনেক শাখায় বিভক্ত। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতিটি শাখাই মনে করে তারাই ঐ ধর্মের একমাত্র সঠিক অনুসারী!

ধর্মশাস্ত্রের অলৌকিকতা

সকল ধর্মই দাবি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ অলৌকিক। ধর্মবাদীদের এ ধরনের দাবি কতটা গ্রহণযোগ্য? যেহেতু পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে এবং প্রতিটি ধর্মের আলাদা আলাদা ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তাই সবগুলো স্বল্প পরিসরে যাচাই করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যদি আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে কেবলমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ বেছে নেই তবে মনে হয় বিষয়টি পুরোপুরি অযৌক্তিক হবে না। আমরা এ আলোচনায় ইসলাম ধর্মের কোরান শরিফকে বেছে নিয়েছি কারণ : (১) পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম। তাই ইসলামে কোরানের অলৌকিকতার পিছনে যেসব প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় তা অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থের তুলনায় বেশ সূক্ষ্ম। (২) এ দেশের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগের মত মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তাই অন্য ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা ঠিক ততটা প্রাসঙ্গিকও নয়। (৩) কোরানের অলৌকিকতার দাবি যাচাইয়ের সাথে সাথে পরোক্ষভাবে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অলৌকিকতার দাবিটিও অনেকটা যাচাইকৃত হয়ে পড়ে। কারণ অলৌকিকতার পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি, বক্তব্য সবগুলো ধর্মে ঘুরে ফিরে প্রায় এক রকম।

ইসলামে প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন এটি স্বয়ং আল্লাহ নবী মুহাম্মদের কাছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নাজিল করেছেন। প্রায় সকল মুসলমানই বিশ্বাস করেন কোরান অবতরণের পর থেকে তাতে আজ পর্যন্ত কোনো বিকৃতি ঘটে নাই এবং তা লওহে মাহফুজে যেমন রয়েছে ঠিক সেই অবস্থায় বর্তমানে রয়েছে। এসব বিশ্বাসের সমর্থনে কোরানে অজস্র আয়াত রয়েছে। এটা হল কোরানের অলৌকিকতায় বিশ্বাসীদের কথা। এবার কোরানের

অলৌকিকতার দাবি কতটা যৌক্তিক সে আলোচনায় আসা যাক।

অলৌকিকতা প্রমাণের দায়িত্ব কার

"Extraordinary claims require extraordinary evidence" **-Carl Sagan**

ধরা যাক, আকমল সাহেবের কাছে একশ'টি বই আছে। তিনি এর মধ্য থেকে একটি বই বের করে বললেন, 'এই বইটি আল্লাহ দ্বারা রচিত আর বাদবাকি নিরানব্বইটি মানুষের দ্বারা রচিত।' এখন একটু ভাবুন এর প্রত্যুত্তরে আকমল সাহেবকে কি বলা যাবে? একজন যুক্তিবাদী প্রথমেই তার কাছ থেকে জানতে চাইবেন তিনি কিভাবে ওটা আল্লাহ প্রদত্ত বলে নিশ্চিত হলেন। এটা জানতে চাইলে আকমল সাহেব উল্টো বলতে পারেন 'আপনিই বরং প্রমাণ করুন ওটা আল্লাহ রচিত নয়।' যুক্তিবাদীদের প্রশ্নের উত্তরে ধর্মবিশ্বাসীদের কাছ থেকে এ ধরনের পাল্টা বক্তব্য প্রতিনিয়ত শোনা যায়। কিন্তু যা প্রমাণ করা যায় নি তা তো এমনিতেই অগ্রহণযোগ্য, একে কি আলাদাভাবে অপ্রমাণ করার প্রয়োজন আছে?

কোথাও অতি দুর্বোধ্য রহস্যময় একটা গ্রন্থ পাওয়া গেল। এখন আমরা নিশ্চয়ই একে অলৌকিক বা ঈশ্বর প্রদত্ত বলে বিশ্বাস করে ফেলব না। যদি কেউ একে অলৌকিক বলে দাবি করেন আর এর স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে পারেন তাহলে একে অলৌকিক বলে মেনে নিতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো গ্রন্থের অলৌকিকতার দাবি করেন তবে স্বাভাবিকভাবেই তা প্রমাণ করার দায়িত্ব ঐ দাবীকারকের। প্রথমেই সেটা যে অলৌকিক নয় এ ব্যাপারটা প্রমাণের দায়িত্ব অন্য কারো উপরে পড়ে না।

মানুষের বই লেখার অভ্যাস অনেক পুরাতন। চিন্তার চর্চা, শিল্প-সাহিত্যের চর্চার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে মানুষের বই রচনা করা জড়িয়ে আছে। একজন আকমল সাহেব বা অন্য কেউ কোনো একটা গ্রন্থকে স্রষ্টা প্রদত্ত বলে দাবি করলে তা অপ্রমাণের দায়িত্ব অন্য কারো উপর পড়ে না এবং তিনি যদি তার দাবি প্রমাণে ব্যর্থ হোন বা তার দেয়া প্রমাণ ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবেই তার দাবি অগ্রহণযোগ্য-এ সহজ কথাটি বুঝার জন্য যদিও গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই তারপরেও ধর্মবাদীরা বরাবরই তা না বুঝার ভান করেন এবং নিজের প্রমাণের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চেপে দিয়ে নিরাপদ থাকতে চান। আপনিই বরং প্রমাণ করুন ওটা স্রষ্টা প্রদত্ত নয়, এ ধরনের অজুহাত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় কেননা এতে করে যে কেউ নিজের রচিত বই বা অন্য কারো লেখা বইকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা অন্য কোনো কারণে ঈশ্বর প্রদত্ত বলে দাবি করতে পারেন এবং তা প্রমাণ করতে না পেরে এ ধরনের ছুতো ধরতে পারেন এবং সবচেয়ে বড় কথা কোনো ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টা প্রদত্ত নয় তা প্রমাণ করা যুক্তিবাদীদের দায়িত্ব নয়। যুক্তিবাদীদের দায়িত্ব এ পর্যন্ত ঐ গ্রন্থকে স্রষ্টা প্রেরিত বলে প্রমাণের জন্য প্রদত্ত যুক্তিগুলো যাচাই করা। তবে কোরানের যেহেতু বস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে তাই যুক্তিবাদীদের কাছে কোরানকে আল্লাহ প্রদত্ত নয় বলে দাবি করা বা প্রমাণ করার পন্থা উন্মুক্ত রয়েছে। মোট কথা, কোনো ব্যক্তি যদি কোরানকে

আল্লাহর দ্বারা রচিত বলে দাবি করেন তবে : (১) এ দাবি প্রমাণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ঐ ব্যক্তির। ঐ ব্যক্তিকে কোরানের সব বাক্য ও শব্দ আল্লাহর রচিত এবং এর সাথে অন্য কিছুর সামান্যতম মিশ্রণ ঘটে নি বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে হবে। (২) যেহেতু ঐ ব্যক্তি কোরানকে আল্লাহর গ্রন্থ বলে দাবি করেছেন তাই সর্বাগ্রে তাকে আল্লাহ বা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। বলা বাহুল্য এ পর্যন্ত স্রষ্টার আস্তিত্বের পক্ষে ধর্মবাদীরা যত ধরনের আর্গুমেন্ট খাড়া করেছেন তার সবগুলোই খণ্ডিত হয়ে গেছে। (৩) স্রষ্টা ঠিক কোন্ প্রক্রিয়ায় কখন, কিভাবে কোরান গ্রন্থখানি মানুষের কাছে পাঠালেন এবং কেন পাঠালেন তা যে উদ্দেশ্যে পাঠালেন তা কতটা সফল হয়েছে এগুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা তাকে দিতে হবে। (৪) মানুষ নিজেকে বিশেষ বিশেষ কারণে (নাম, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি) নবী ও রসুল দাবি করতে পারে। ঐ ব্যক্তিই নবী ও রসুল ছিলেন এ বিষয়টিও তাকে প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে তিনি কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে বা বাধ্য হয়ে বা পরিস্থিতির শিকার হয়েও নিজের বা অন্য কারো রচনাকে ওহি বা প্রত্যাদেশ বলে ঘোষণা দেন নি। (৫) যেহেতু কোরান অবতীর্ণ হওয়া একটি অলৌকিক ঘটনা তাই অলৌকিক ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে তাও প্রমাণ করতে হবে।

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহর কাছ থেকে ওহি নিয়ে আসতেন নবী মুহাম্মদের কাছে। জিবরাইলের অস্তিত্বও শুধু কথার কথা নয়, প্রমাণ সাপেক্ষ হতে হবে।

উপরোক্ত পয়েন্টগুলো কোরান বা যে কোনো অলৌকিক দাবিকারী গ্রন্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ সমস্ত পয়েন্টগুলো যতক্ষণ অলৌকিকতার দাবিদাররা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে না পারছেন ততক্ষণ একজন যুক্তিবাদীরও কোরান বা কোনো গ্রন্থকে অলৌকিক বলে মেনে নেয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

ওহি অবতরণ পদ্ধতি ও কিছু কথা

কোরান আল্লার বাণী। এমনটা প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানই বিশ্বাস করে থাকেন। কোরান ২৩ বছর ধরে নবী মুহাম্মদের উপর নাজিল হয়েছে। নাজিল হওয়ার পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। সত্য স্বপ্ন : নবী রসুলগণের স্বপ্নও ওহি। বিশেষ করে হজরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর অনেক প্রত্যাদেশ বা ওহি লাভ করেছেন স্বপ্নের মাধ্যমে। এই স্বপ্নকে বলা হয় সত্য বা বাস্তব স্বপ্ন। এ এমনই স্বপ্ন যা অবাস্তব হয় না বা বিফলে যায় না। হজরত আয়েশা (রা) ইরশাদ করেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর উপর ওহির সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। রসুল মুহাম্মদ (সঃ) মাদানি জীবনে যে স্বপ্ন দেখেন তা কোরানে এসেছে এভাবে : আল্লাহ তার রসুলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন যে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। (দ্রষ্টব্য : সুরা আল ফাতহ)। নবী হজরত ইব্রাহিম (আ.) তার পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে কোরবানি করার আদেশও লাভ

করেছিলেন স্বপ্নের মাধ্যমে। আরো অনেক নবী স্বপ্নের মাধ্যমে ওহি লাভ করেছেন বলে জানা যায়।

২। ঘণ্টা ধ্বনি পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে মহানবী (সঃ) এর উপর ওহি নাজিল হত। ওহি নাজিল হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত হতে তাঁর কানে এ ঘণ্টা ধ্বনি বাজতে থাকত। তাঁর কাছে উপস্থিত কোন কোন সাহাবিও এ ঘণ্টা ধ্বনি শুনেছেন বলে জানা যায়। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হজরত হারিস ইবনে হিশাম রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন হে আল্লাহর রসুল আপনার নিকট কিভাবে ওহি আসে? এর উত্তরে রসুল বলেন- কখনও কখনও আমার নিকট ওহি আসে ঘণ্টা ধ্বনির মত। এ প্রকার ওহি আমার খুবই কষ্টকর মনে হয়। তবুও সে (জিবরাইল) যা বলে আমি তা তাৎক্ষণিক আয়ত্ব করি।

এই ঘণ্টা ধ্বনি কিসের ধ্বনি সে বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, এটি আল্লাহর কথা বলার ধ্বনি। কেউ বলেছেন এটি জিবরাইল (আ.) -এর পা বা ডানার ধ্বনি ইত্যাদি।

৩। অন্তর্লোকে ঢেলে দেয়া পদ্ধতি : একে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 'ইলক্বায়ি ফিল ক্বালব' বা অন্তরে ওহি সঞ্চারণ পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা হয়। নবী মুহাম্মদ এ বিষয়ে ইরশাদ করেছেন : 'রুহুল কুদুস জিবরাঈল (আ) আমার অন্তর্লোকে ঢেলে দিয়েছেন বা সঞ্চারিত করেছেন বা ফুঁকে দিয়েছেন।' এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে স্বয়ং আল্লাহ রসুলের অন্তরে তার ওহি সরাসরি সঞ্চার করেন নিজ ক্ষমতা বলে।

৪। ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন : ফেরেশতাগণের নিজ নিজ আকৃতি রয়েছে। হজরত জিবরাইল নিজ আকৃতিতে প্রকাশিত হন আবার কখনও কখনও মানব আকৃতিতেও প্রকাশিত হন নবী মুহাম্মদের নিকট। সহি হাদিস থেকে জানা যায় হজরত জিবরাইল মানুষরূপে রসুলের নিকট এসে আল্লাহর ওহি পৌঁছে দিতেন। সিংহভাগ ক্ষেত্রে সাহাবিগণ উক্ত মানুষটি দেখতে পেতেন কিন্তু বুঝতে পারতেন না যে উক্ত মানুষটি আসলে মানুষ নয় ফেরেশতা। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত দাহিয়াতুল কালবী (রা) এর আকৃতিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফেরেশতা ওহি নিয়ে আসতেন। অন্য সাহাবি বা অপরিচত লোকের আকৃতিতেও ফেরেশতা ওহি নিয়ে আসতেন।

৫। নিজ আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন : আল্লাহ হজরত জিবরাইলকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সে আকৃতিতেও তিনি রসুল মুহাম্মদের নিকট ওহি নিয়ে আসতেন বলে জানা যায়। কোরানের প্রথম ওহি হেরা পর্বতের গুহায় লাভ করেন তখন হজরত জিবরাইল (আ.) নিজ আকৃতিতে আগমন করেছিলেন। রসুল মুহাম্মদ দুবার বা তিন বার তাঁকে তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখেছেন বলে জানা যায়। যেমন (১) একবার হেরা পর্বতের গুহায় (২) একবার মিরাজকালে সিদরাতুল মুনতাহায় (৩) আরেক বার ওহি বন্ধের পরে পুনঃ ওহি চালুর সময়।

৬। পর্দার অন্তরাল হতে : আল্লাহ রসুল মুহাম্মদের প্রতি তার জাগ্রতকালে পর্দার

আড়াল হতে সরাসরি ওহি পাঠিয়েছেন। পর্দার অন্তরালে আল্লাহ কথা বলেছেন পর্দার বাইরে হজরত মুহাম্মদ-এর সঙ্গে। মিরাজ রজনীতে আল্লাহ মুহাম্মদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানা যায় এবং এ পদ্ধতিতেই তার প্রতি প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত এবং পরবর্তী পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান অবতীর্ণ ও ফরজ হয় এই মিরাজ রজনীতে।

৭। তন্দ্রাকালে ওহি লাভ : রসুল মুহাম্মদ যেমন জাগ্রত অবস্থায় ওহি পেয়েছেন তেমন পেয়েছেন নিদ্রিত অবস্থায়। একটি রিওয়ায়াত হতে জানা যায় নবী মুহাম্মদ এ পদ্ধতিতে সাতবার ওহি পেয়েছেন।

৮। হজরত ইসরাফিল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহি লাভ : আল্লাহ কখনও কখনও হজরত ইসরাফিল (আ.)-এর মাধ্যমে রসুল (সঃ)-এর নিকটে ওহি পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়।

ওহির অবতরণ পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ কোরানে বলেছেন : কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহ তার সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন সরাসরি ওহি ব্যতীত, কিংবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত কিংবা দূত প্রেরণ ব্যতীত অতঃপর উক্ত দূত (মানুষের নিকট) তাঁর ইচ্ছামাফিক তার প্রত্যাদেশ পৌঁছে দিবে তার অনুমতিক্রমে।

হাদিসে রয়েছে ওহি নাজিল হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে রসুল হজরত হারিছ ইবন হিশাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে রসুল বলেন : কখনও আমার নিকট ওহি আসত ঘণ্টা ধ্বনির মত। এটি আমার উপর অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়। এতে আমার ঘাম বেরিয়ে যায়। তবুও ফেরেশতা যা বলে আমি তা তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্ত করে লই। কখনও কখনও ফেরেশতা আগমন করে পুরুষের আকৃতিতে। অতঃপর সে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে। সে যা বলে আমি তা তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্ত করে লই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি যে তাঁর (রসুল (সঃ)-এর) উপর ওহি আসে কঠিন শীতের দিনে, এতে তাঁর কষ্ট ও উষ্ণতাপ অনুভূত হয় আর তখন তাঁর ললাট হতে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ে। (সহি বোখারি ও সহি মুসলিম।" (দ্রষ্টব্য : এবিএম আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম, উচ্চমাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, দ্বিতীয় পত্র, চতুর্থ সংস্করণ, জুন,২০০৫, পৃষ্টা ২৬-২৮। প্রকাশক হাসান বুক হাউসের পক্ষে ডঃ মুহাম্মদ আবুল হাসান, ৬৫, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০)।

[সহি বোখারি শরিফের ওহি অবতরণ সম্পর্কিত হাদিসগুলো হচ্ছে :

Volume 1, Book 1, Number 2; Volume 1, Book 1, Number 3; Volume 1, Book 1, Number 4; Volume 4, Book 52, Number 95; Volume 4, Book 54, Number 438; Volume 4, Book 54, Number 458; Volume 4, Book 54, Number 461; Volume 5, Book 59, Number 618; Volume 5, Book 59, Number 659; Volume 6, Book 60, Number 447; Volume 6, Book 60, Number 448;

Volume 6, Book 60, Number 478; Volume 6, Book 60, Number 481; Volume 6, Book 61, Number 508 ইত্যাদি]।

ওহি অবতরণের পদ্ধতিগুলো সামান্য কিছু যৌক্তিক সংশয় প্রকাশ করা যাক। বলে নেয়া ভাল এর দ্বারা কারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত করার অভিপ্রায় আমাদের নেই। বরং মানব মনের নিখাদ জিজ্ঞাসাগুলোই আমরা প্রকাশ করতে চাচ্ছি।

নবী মুহাম্মদ স্বপ্নকে ওহি বা প্রত্যাদেশ বলে মনে করেছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন করার পরিসর ছোট। কেউ যদি নিজে কিছু রচনা করেন (হতে পারে হোমারের ইলিয়ট, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, কিংবা শেক্সপিয়রের হেমলেট) পরবর্তীতে তা স্বপ্নের মাধ্যমে ওহি হিসেবে পেয়েছেন বলে দাবি করলে তা প্রমাণিত হবে কিভাবে? আমাদের দেশে অনেক কবিরাজ রয়েছেন যারা দাবি করেন স্বপ্নে পাওয়া গাছ-গাছড়ার সাহায্যে তারা চিকিৎসা করেন।

শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিরা (মৃগী রোগ বা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত) অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ শুনে থাকেন।

ওহি নাজিলের সময়ে নবী মুহাম্মদ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন, দাঁত কপাটি লেগে যেত অনেক সময়। তখন সাহাবিরা তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতেন ইত্যাদি। ওহি নাজিল পদ্ধতিটি যদি আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হজরত মুহাম্মদের এত কষ্ট বা বিভিন্ন ধরনের বিপত্তি হওয়ার কারণ কি? হজরত মুহাম্মদ নিজেই বলছেন ঘণ্টা ধ্বনি পদ্ধতিটি তাঁর কাছে খুব কষ্টকর ছিল। কোরান যেহেতু বরকতময় এবং প্রশান্তিদায়ক তাহলে এটি নাজিল হলে আরাম অনুভব হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। শোনা যায় কোরান যদি পাহাড়ে নাজিল হত তবে তা ধ্বংস হয়ে যেত আর কোরান নাজিল হওয়ার সময় হজরত মুহাম্মদ উটের উপরে থাকলে উট না-কি ভারের আধিক্যে অস্থির হয়ে উঠতো। কোনো গ্রন্থকে কত বিচিত্রভাবেই মহিমান্বিত করা যায়। উপরের বর্ণনায় ঘণ্টা ধ্বনিটি কিসের তার যে বিবরণ বিভিন্ন বুজুর্গরা দিয়েছেন তা ব্যঞ্জনাময়।

অন্তর্লোকে ঢেলে দেয়া পদ্ধতিটি একটু অন্যরকম। কারো যদি নিজের সৃষ্টিশীল চিন্তায় হঠাৎ কিছু তৈরি হয় কিন্তু তিনি যদি বলে থাকেন এটা স্রষ্টা প্রদত্ত এবং পরবর্তীতে তা ওহিরূপে কাব্যে বা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন সেক্ষেত্রে প্রমাণ-অপ্রমাণের জন্য কোনো জায়গা খালি থাকে না। তাই পদ্ধতিটি বেশ সুবিধাজনক।

বলা হয় ফেরেশতারা অনেক সময় মানবাকৃতি ধারণ করে এসে হজরত মুহাম্মদকে আল্লাহর বিভিন্ন বার্তা পৌঁছে দিতেন। কিন্তু সংশয়বাদী মনে প্রশ্ন জাগে এই মানুষগুলো কারা ছিল? একজনের নাম জানা যায় দাহিয়াতুল কালবি। এই ব্যক্তির সাথে কি হজরত মুহাম্মদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল? ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আসার প্রয়োজনটা কি ছিল আর মাঝে মাঝে দাহিয়ান কালবি'র রূপ ধারণের কারণ কি ছিল তা কিছুটা ভাবলেই আঁচ করা সম্ভব।

বলা হয় ফেরেশতাদের নিজস্ব আকৃতি রয়েছে যদিও তারা যে কোন কিছুর আকৃতি ধারণ করতে পারেন। ফেরেশতাদের কারো কারো আকার এত বড় যে পৃথিবীর সব জল ঢেলে দিলেও এক ফোটা জল দেহ থেকে বেয়ে পড়বে না। কারো কারো রয়েছে হাজার হাজার ডানা, কারো আবার প্রতিটি পশমেই মাথা, হাত, পা সংযুক্ত ইত্যাদি। ফেরেশতারা ডানা দিয়ে কি করেন তা বোঝা যায় না। কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরই তো বাতাস নেই, সেখানে ডানা ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের বাহুল্যময় বর্ণনার একটা কারণ থাকতে পারে—চৌদ্দশত বছর আগেকার আরবে জিন, ভূত, ডাইনি, বাণ মারা জাদুটোনা, ইত্যাদির ধারণা ইসলাম ধর্মের পূবেই খ্রিস্টান, ইহুদিসহ বিভিন্ন প্যাগান জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল।

জিবরাইলকে রেখে ইসরাফিল ওহি নিয়ে কেন আসতেন তা বোঝা সহজ নয়। ইসরাফিল শিঙ্গা হাতে বসে আছেন কেয়ামতের ঘোষণা দেয়ার জন্য। তার কর্তব্য বাদ রেখে ওহি নিয়ে আসা কি অস্বাভাবিক নয়? পর্দার অন্তরাল হতে কেন ওহি নাজিল হতো তা বোধগম্য হয় না। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হজরত মুহাম্মদের সম্মখে নিজেকে প্রদর্শন করলে সমস্যা কি ছিল? অনেকে হয়ত বলবেন নবী মুহাম্মদ তা সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ তো ইচ্ছে করলেই সে ক্ষমতা তাঁকে দিতে পারতেন। আরেকটি ব্যাপার পরিষ্কার নয়, ঐ পর্দা ঠিক কিসের পর্দা? পর্দার অন্তরাল হতে আল্লাহ যদি ওহি পাঠাতে পারেন তবে জিবরাইলকে দিয়ে পাঠালেন কেন? আল্লাহ যদি সব জায়গায় থেকে থাকেন তবে হজরত মুহাম্মদকে কেন মিরাজের রজনীতে ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বেহেশত-দোজখ সবকিছু পরিদর্শন করিয়ে পর্দার অন্তরাল হতে আলাপ করলেন তা বোঝা যায় না। আল্লাহর আতিথেয়তা বাঙালিসুলভ নয়।

মাঝে মাঝে জটিল চিন্তায় আচ্ছন্ন অবস্থায় যদি তন্দ্রার ভাব আসে আর তখন যদি কিছু নতুন আইডিয়া মাথায় জন্ম নেয়, তাহলে ওগুলোকে কি ওহি বলতে হবে?

আরো কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। যেমন আল্লাহ বা স্রষ্টা সরাসরি বা জিবারাইল বা দূত মারফত নবী-রসুলদের সাথে যেমন যোগাযোগ করতেন সে রকমভাবে সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ করলে সমস্যা কোথায়? অনেকে বলবেন, তাতে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা ব্যাহত হবে। আমরা বলব, আল্লাহর পক্ষে তাতে বরং মানুষের পরীক্ষা নেয়া বাস্তবসম্মত হত কেননা এতে করে মানুষ আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর সমাধান পেত ও আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার একটা উপায় খুঁজে পেত এবং এতে করে ধর্ম না মানার জন্য পরকালের অবর্ণনীয় শাস্তি ব্যবস্থার কিছুটা হলেও যৌক্তিকতা থাকত।

আল-কোরানের অলৌকিকতার দাবিসমূহের প্রতি সংশয়ী ভাবনা

পূর্বে বিশদভাবে বলা হয়েছে কোনো গ্রন্থকে অলৌকিক বা স্রষ্টার বাণী দাবি করলে প্রমাণের দায়িত্ব দাবিকারকদের। যাকে দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় বলে 'Burden of Proof'। আবার দাবি প্রমাণ করতে না পারলে বা ভুল হলে তাদের দাবিও অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে।

মুসলিম ধর্মবেত্তারা কোরান শরিফকে অলৌকিক প্রমাণ করতে অনেক ধরনের দাবি উত্থাপন করে থাকেন। নীচে এগুলোর কিছু অংশ উল্লেখ করা হল আর সাথে আমাদের সংশয়ী ভাবনা।

১। কোরান সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত কেউ কোরানের মত কোনো গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং এটা আল্লাহর রচিত।

এ যুক্তিটি কোরান থেকে আহরিত। কোরানে বলা হয়েছে : "তারা যদি (তাদের দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে কোরানের মত কোনো গ্রন্থ তারা রচনা করুক।"(সুরা তুর, আয়াত ৩৪)। "আপনি বলে দিন, "কোরানের অনুরূপ কোন কিছু রচনা করার জন্য যদি সকল মানুষ ও জিন একত্রিত হয় ও তারা পরস্পর সহযোগিতা করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কোন কিছু রচনা করতে পারবে না।"(সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৮৮)। "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তার অনুরূপ কোন সুরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।"(সুরা বাকারা, আয়াত ২৩-২৪)।

কোরানের শ্রেষ্ঠত্বের এই দাবি যতটা উত্থাপিত হয় ততটা শক্ত ভিত্তি নেই। আমার গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ, এর মত গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয় এ ধরনের দাবি কোনো অর্থ বহন করে না। কোরানের সমমানের হতে কী কী মানদণ্ড রয়েছে তার বর্ণনা কোরান শরিফে নেই। কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে কোরানের সমতুল্য হয়ে যাবে অন্য কোনো গ্রন্থ সেই ব্যাখ্যাও ইসলামি পণ্ডিতরা একমত হয়ে দিতে পারেন না। কোরান শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এর মত কোনো গ্রন্থ রচনা অসম্ভব এরকম দাবি করলে যে প্রশ্ন সর্বাগ্রে চলে আসে, তা হলো কোন দিক দিয়ে কোরান শ্রেষ্ঠ? আর কে-কিভাবে কোরানের এই শ্রেষ্ঠত্ব নিরুপণ করেছেন?

শ্রেষ্ঠতা নিরুপণের জন্য আরো কিছু বিষয় বিবেচনা করা যাক:

ক) ছন্দময়তা : কোরান শরিফকে অনেককেই খুব ছন্দময় গ্রন্থ বলতে শোনা যায়। সুরা নাসে আমরা পাই প্রতিটি আয়াতের শেষে 'স' রয়েছে। এটি উন্নতমানের কোনো ছন্দ বলা যায় না কারণ এই ধরনের ছন্দ অনেক সময় একঘেয়েমির সৃষ্টি করে থাকে এবং একে সাধারণ ছন্দবন্ধ ছড়ার মত করে তোলে। এছাড়া কোরানের বেশির ভাগ আয়াতে এই ছন্দ-বদ্ধতাও নেই। আবার ছন্দ থাকা অলৌকিকতার প্রমাণ হয় কিভাবে? মানুষ অজস্র ছন্দময় কবিতা-ছড়া-গান রচনা

করেছে। আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দের জাদুকর হিসাবে খ্যাত। তিনি কখনো তার এই ছন্দ বা ছন্দ প্রতিভা অলৌকিকভাবে রপ্ত বলে দাবি করেন নাই।

খ) সুরেলা : কোরানকে খুব সুরেলা গ্রন্থ দাবি করা হয়। কোরান যেহেতু একটা গ্রন্থ এবং 'সুরৎ বিষয়টি কৃত্রিম বা মানুষের আরোপিত তাই এটি কোরানের মৌলিক ধর্ম নয়। কোরান যখন সুর করে পড়া হয় তখন বিশ্বাসীরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। কোরানের অংশ নয় এমন কিছু কোরানের মত সুর করে বা গাম্ভীর্য আর ভাব নিয়ে পাঠ করলে কোরানের অলৌকিকতায় বিশ্বাসীরা (যারা জানেন না এটি কোরানের অংশ নয়) পূর্বের মতোই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। আর কোনো কিছু সুরেলা, মাধুর্যময় করে তোলাটা পাঠকের বা গায়কের অবদান। কোরানের বাণী আল্লাহ অডিও ফরম্যাটে পাঠিয়েছেন এমনটা তো নয়। এছাড়া কেউ যদি হেড়ে গলায় কোরান পাঠ করতে থাকেন তবে তা যতই শুদ্ধ হোক না তা বিরক্তির উদ্রেক করবে। কোরানের বাণী শুনলে বা পড়লে যদি কারো একে অলৌকিক বলে মনে হয় তবে তা একে অলৌকিক বলে প্রমাণ করে না। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির কাছে ঠিক কোন কারণে একে অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে তা-ই আসল বিষয়।

কেউ যদি আপনাকে ওমর খৈয়ামের কবিতার মত কবিতা লিখতে বলে আপনি তাকে কি বলবেন? কেউ যদি চর্যাপদকে অলৌকিক বলে দাবি করে তবে এর জবাবে কি কেউ এ ধরনের কোনো গ্রন্থ রচনা করবে বা করতে যাবে? কোরানের সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৮৮-এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন মানুষ ও জিন সবাই মিলেও কোরানের মত কিছু রচনা করতে পারবে না। এ ধরনের কথার অর্থ উদ্ধারও মানুষের জন্য দূরহ বটে। আচ্ছা, মানুষ আর জিন জাতি কীভাবে একত্রিত হবে আর কে তাদের একত্রিত করবে? কোরান রচনার জন্য সকল মানুষই বা এক হবে কেন? একইসাথে কোরানের অলৌকিকতায় সন্দেহকারীদের সতর্ক করা হচ্ছে, "যদি তোমরা (সুরা রচনা করে তা) আনয়ন না কর এবং কখনই পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে" (সুরা বাকারা, আয়াত ২৩-২৪)। এ যে মানব মনের চিরন্তন অভ্যাস সন্দেহ-সংশয়ের প্রতি তীব্র বিষেদাগার। অথচ সংশয়বোধ আছে বলেই সভ্যতা এগোয়, মানুষ সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। সভ্যতা কখনোই এগুতো না, যদি সবাই শোনামাত্র, দেখামাত্রই অন্ধের মত বিশ্বাস করে ফেলতেন। এই সহজ সত্যটি ধর্মবেত্তারা কবে উপলব্ধি করবেন?

কেউ কোরানের মত কোনো গ্রন্থ রচনায় অক্ষম হলেও তা কোরানকে অলৌকিক বলে প্রমাণ করে না। তখন অবশ্যই কোরান 'অনন্য' এবং লেখকরা হবেন দক্ষ, কুশলী লেখক ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো অলৌকিকতার প্রমাণ নয়।

২। কোরান শরিফ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। আর তা আল্লাহর বাণী বা অলৌকিক গ্রন্থ বলেই সম্ভব।

এ ধরনের দাবি ইদানীংকালে অধিকমাত্রায় শোনা যায়। কোনো একটি গ্রন্থই যদি সকল

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হয়ে থাকতো তবে মানুষ কেন যুগ-যুগ ধরে জ্ঞান অর্জনের নেশায় এত শ্রম দিচ্ছে এমনকি জীবন পর্যন্তও দিয়ে দিচ্ছে। কোরান থাকা সত্ত্বেও কেন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অমুসলিম দেশের তুলনায় মুসলমান জাতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পিছিয়ে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছেন, অমুসলিম রাষ্ট্র ইসরাইলে একাই রয়েছে তার থেকে দ্বিগুণ সংখ্যক বিজ্ঞানী। এটা মনগড়া কোনো বক্তব্য নয়। পাকিস্তানি নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ আমির আলী হুডবয়ের দেয়া তথ্য। (দ্রষ্টব্য : Parvez Hoodbhoy, Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality, 1992)।

বিজ্ঞান নতুন কিছু আবিষ্কারের পর পরই আমাদের ধর্মগ্রন্থে ওটা আগে থেকেই ছিল এমন ধরনের নিরর্থক দাবি প্রায় সব ধর্মের ধর্মাবলম্বীরা করে থাকেন। খ্রিস্টানরা বাইবেলের বর্ণিত বাণীর মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজে বেড়ায়। হিন্দুরা বেদ-গীতায় বিজ্ঞান খুঁজছে। এ গ্রন্থের পূর্বের একটি অধ্যায়ে হিন্দুদের এমন দাবি উন্মোচন করা হয়েছে। বিজ্ঞান কোনো কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করার পর পরই তা ধর্মবাদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যান। বড় তাজ্জব বিষয়, পূর্বে কেন এরা বিজ্ঞানের আবিস্কৃত বা উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মন্তব্য করতে পারেন না? বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যেসব বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কিংবা যেসব বিষয় আবিষ্কার করতে পারেনি, সেসব বিষয় নিয়ে তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে কি আলামত ব্যক্ত রয়েছে ধর্মবেত্তারা যদি একটু কষ্ট করে হলেও আগেই একটি তালিকা তৈরি ফেলেন তবে ধর্মগ্রন্থের 'বিজ্ঞানময়' দাবি সম্পর্কে যাচাই করার পথ পাওয়া যাবে।

যারা মনে করেন ধর্মগ্রন্থই জ্ঞানের উৎস, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক, ধর্মগ্রন্থ থেকে কোন জ্ঞান আপনি লাভ করেছেন যা অন্য উৎস থেকে পাওয়া যাবে না। পরিচিত অনেককে জিজ্ঞেস করা হলেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি।

এছাড়া ধর্মগ্রন্থগুলো আদৌ কোনো জ্ঞান রয়েছে কি-না তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা যে কোনো ধরনের জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ, বর্ণনা, দালিলিক প্রমাণ, তথ্য। যা ধর্মগ্রন্থসমূহ সরবরাহে ব্যর্থ। কোনো একক শাস্ত্র যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হয়ে থাকে তাহলেও একে অলৌকিক বলা যায় না। বরং তা একে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস' বলে প্রমাণ করে।

অনেকের কাছে ইসলাম-পূর্ব মানুষের অগ্রগতি অজ্ঞাত। কোরান পরবর্তী সকল অগ্রগতি কোনো না কোনোভাবে কোরানের অবদান রয়েছে বলে মনে করে। তারা গ্রিসের আয়োনীয় দার্শনিকদের বস্তুবাদী ভাবনা সম্পর্কে অবগত নয়, সক্রেটিসের সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত নয়। এরিস্টটল-প্লেটোর অবদানের ব্যাপারে তারা বেখবর। হিব্রু সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, ব্যবলনীয় সভ্যতা, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি তাদের কাছে অজানা কিছু।

৩। কোরান যদি অলৌকিক গ্রন্থ না হত তবে তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা বা

অসঙ্গতি থাকত। কোরান যদি অলৌকিক গ্রন্থ না হত তবে তা বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত না। যেহেতু কোরানে বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুই পাওয়া যায় নি তাই এটি অলৌকিক গ্রন্থ।

এ বক্তব্যটিও কোরানে বর্ণিত আছে : "তারা কি কোরান অনুধাবন করে না? তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে নাজিল হত তবে তারা এতে বহু অসঙ্গতি পেত।" (সুরা নিসা, আয়াত ৮২)।

কোনো গ্রন্থ যদি আল্লাহ বা স্রষ্টা লিখে থাকেন তবে তাতে অসঙ্গতি থাকতে হবে কেন? আল্লাহ ছাড়া যারাই বই লিখেছেন তাদের বইতে কি নানা রকম অসঙ্গতি রয়েছে?

কোনো গ্রন্থে অসঙ্গতি পেতে হলে ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে নির্মোহ থাকতে হবে। আবেগ, পরম বিশ্বাস, আর অলৌকিক ভাবনায় তাড়িত থাকলে, নিজের মতাবলম্বী গ্রন্থ সম্পর্কে নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়া সম্ভব হয় না।

একটা গল্প বলি : 'এক লোক একবার বলেছিল সে সারা দিন ঘুমিয়েছিল। পরে দেখা গেল সে ঐ দিনে মোটেও ঘুমায়নি, রাত্রে ঘুমিয়েছিল। পরে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, দিন তো সূর্যের আলোযুক্ত রাত। আমি দিনে ঘুমাইনি তো কি হয়েছে, রাতে ঘুমিয়েছি। আর দুটোই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আমার কথার সত্যতা বুঝতে হলে তা বুঝার মত জ্ঞান থাকতে হবে।' এ ধরনের বক্তব্য ধর্মগ্রন্থের কৌশলী ব্যাখ্যাকারকরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারেবারে দেয়ার চেষ্টা করেন। সব ধর্মগ্রন্থেই পরস্পর বিরোধী প্রচুর বক্তব্য রয়েছে কিন্তু ব্যাখ্যাকারকরা এগুলোকে ঐ গল্পের মত করে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাথে একদল বুজুর্গ ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে বিজ্ঞানময় করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলেন। ধর্মগ্রন্থের কোনো বাণীর সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাংঘর্ষিক হলে ধর্মগ্রন্থের শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যা পরিবর্তন করেন। নতুন অভিধান তৈরি করেন, আধুনিক তফসির বানিয়ে নেন। অবশেষে দাবি করেন তাদের ধর্মগ্রন্থে সবই ছিল ঐ বিষয়টি বিজ্ঞান খোঁজে পাবার আগেই।

কোরানে বর্ণিত অসঙ্গিতপূর্ণ আয়াতগুলোকে ঈমানদাররা বলে থাকেন 'এগুলো রূপক। এর ব্যাখ্যা আমরা জানবো না।' নতুবা বলেন 'এই হুকুম রহিত করা হয়েছে।' রহিত বা মনসুখ আয়াত সম্পর্কে আপত্তি তোলা যায় এই বলে যে এ হুকুম পরবর্তীতে রহিত হয়ে যাবে জেনেও আল্লাহ কেন এই আয়াত নাজিল করলেন? যেহেতু কোরান কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সর্বকালের জন্য অনুসরণযোগ্য গ্রন্থ বলে দাবি করা হয়। ধর্মগ্রন্থে রূপক এত বেশি কেন? যে বিষয়টি সাধারণের বোধগম্যের বাইরে তা সাধারণের গ্রন্থ হয় কিভাবে?

"আর আমি পাঠাইলাম নুহ্‌কে তাহার ক্বওমের প্রতি, অতঃপর তিনি উহাদের মধ্যে অবস্থান করিলেন পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বৎসর, অনন্তর প্লাবন আসিয়া তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, বস্তুত তাহারা বড়ই অনাচারী লোক ছিল।" (সুরা আনকাবুত, আয়াত ১৪)।

আয়াতটিতে আরবি ভাষায় বর্ণিত 'আলফা সানাতিন ইল্লা খামছিনা আ'মা' মানে হল-পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বৎসর। অর্থাৎ হজরত নুহ্ ন্যূনতম ৯৫০ বৎসর বেঁচেছিলেন। (এই সানাতুন শব্দ থেকে বাংলা "সন" শব্দটি এসেছে)।

কোনো মানুষের পক্ষে এতো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এবং আগেকার মানুষের গড় আয়ু ছিল বর্তমানে সময়ের মানুষের গড় আয়ুর তুলনায় অনেক কম। এখন ঈমানের জোরে কেউ যদি মনে করেন, হজরত নুহ্ের উম্মতেরা ১২ মাসে বছর হওয়াটা জানত না, তারা অপেক্ষাকৃত কম দিনকে বছর বলে মনে করতো তবে এই ব্যাখ্যাটিও ধোপে টিকে না। কারণ কোরানের এ আয়াতে স্রষ্টা আল্লাহ বক্তা। তিনি তো ১২ মাসে বছর হওয়ার ব্যাপারটা জানতেন। আর তিনি এটাও জানতেন, তিনি যদি বলেন নুহ্ ন্যূনতম ৯৫০ বছর বেঁচে থাকেন তবে আরবের মানুষেরা এর মানে কী বুঝবে?

ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি এক দ্বীপে ৩ বছর কাঠিয়ে আসলো। কিন্তু ঐ দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে সেটি ৫ বছর। এখন ঐ ব্যক্তি দ্বীপ থেকে ফিরে এসে কি বলে বেড়াবে সে ৫ বছর দ্বীপে থেকেছে? নুহ্ের উম্মতেরা কম দিনে বছর পরিমাপ করত এ কথার কোনো প্রমাণ নেই এবং কোরান শরিফের কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই।

আরেকটি আয়াত হচ্ছে : 'আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে, তখন তার আরশ (সিংহাসন) ছিল পানির উপরে।' (সুরা হুদ, আয়াত ৭)।

আয়াতটি একেবারেই সরল। এই আয়াতে আরবিতে 'সিত্তাতি আইয়্যাম' বলতে খুব পরিষ্কার ভাষায় ছয় দিন বুঝাচ্ছে আর 'মাউন' মানে পানি। প্রশ্ন সৃষ্টির পূর্বে দিন এল কিভাবে, পানিই বা এল কিভাবে? সিংহাসন পানির উপরে রয়েছে—এখান থেকে কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ পায়?

আরো কিছু আয়াত : 'আর তিনিই প্রতিরোধ করিয়া রাখিতেছেন আসমানসমূহকে পড়িয়া যাওয়া হইতে।' (সুরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৬৫)।

এত বড় নীল আকাশ কিভাবে উপরে ঝুলে রয়েছে তখনকার মানুষের জন্য একটা বিশাল বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল। কোরানে অন্যত্র রয়েছে : 'লোকদের উপর প্রতিষ্ঠিত আকাশমণ্ডলের প্রতি কি ওরা কখনও তাকিয়ে দেখেনি, কিভাবে আমরা সেটি নির্মাণ করেছি এবং সেটিকে চাকচিক্যময় বানিয়েছি এবং তাতে কোন ফাটল নেই। (সুরা ক্বাফ, আয়াত ৬)।

এই আয়াতে আকাশ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। আকাশ কোনো বস্তু নয়, পদার্থ নয়, পৃথিবী নামক বাড়ির ছাদ নয়। অথচ হিন্দুদের বেদ, গীতা, খ্রিস্টানদের বাইবেল সবগুলো ধর্মগ্রন্থেই আকাশ বাড়ির ছাদের মত কল্পনাশীল বক্তব্য পাওয়া যায়। কোরানে রয়েছে : 'তোমরা কি জান না আল্লাহ কেমন ভাবে সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?' (সুরা নুহ্, আয়াত ১৫)।

সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে—এর অর্থ কি?

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই উপযোগী যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাকে সংবাদবাহী বানান যাহাদের দুই দুইটি, তিন তিনটি ও চার চারটি পালক বিশিষ্ট ডানা আছে। (চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে) বরং তিনি সৃষ্টিতে যত ইচ্ছা অধিক করিয়া থাকেন। (সুরা ফাতির, আয়াত ১)। হাদিসে বর্ণীত আছে, জিবরাইলের ছয় শত ডানা রয়েছে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে তো বাতাস নেই। সেক্ষেত্রে এই ডানা থাকার উপযোগিতা কী? মনে হয়, চৌদ্দশত বছর পূর্বের মানুষ জানতো না পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উচ্চতা কত? বাতাস কতটুকু পর্যন্ত পাওয়া যায়? ডানার ব্যবহার বা এর উপযোগিতা কি? (কোরানের মধ্যেকার কিছু অসঙ্গিতর তালিকা রয়েছে নীচের ওয়েব সাইট দুটিতে :
http://www.islam-atch.org/AbulKasem/quranic.contradictions/index.htmlএবং
http://www.1000mistakes.com/1000mistakes/index.php)।

আগেই বলা হয়েছে এগুলো কোনো যুক্তি হতে পারে না। কোনো গ্রন্থে যদি কোনো অসংগতি নাও থাকে তবে তা আল্লাহ বা স্রষ্টা কর্তৃক রচিত হয়ে যায় না। কোনো মহাজ্ঞানীর মুখের কথার ভিত্তি নেই।

৪। বিশ্বের কোটি কোটি লোক কোরানকে আল্লাহর রচিত বলে রায় দিয়েছে।

এটা কোনো প্রমাণ বা যুক্তি নয়। বরং আপ্তবাক্য। সত্যতা ভোট দ্বারা নির্বাচিত হয় না। বিশ্বের কোটি কোটি লোক কোরানকে অলৌকিক মনে করে বলেই যদি তা অলৌকিক হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেগুলোও কোটি কোটি লোক অলৌকিক বলে মনে করে সেগুলোও অলৌকিক হবে না কেন? আবার, কোরানকে যত লোক অলৌকিক বলে মনে করে তারচেয়ে বহুগুণ বেশি মানুষ (অমুসলিম) একে অলৌকিক বলে মনে করে না। তাহলে? এক সময় বিশ্বের প্রায় সকল লোকই বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, তাই বলে কী তা সত্য হয়ে গিয়েছিল? অনেক লোক কোনো কিছু বললেই বা বিশ্বাস করলে তা সত্য হয়ে যায়- এ ধরনের আর্গুমেন্টকে দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বলে Argumentum ad populum যা যুক্তিবিদ্যায় পরিত্যাজ্য।

৫। যেহেতু আল্লাহ আছেন তাই তিনি অবশ্যই মানুষের জন্য একটা গাইডলাইন দিবেন আর এটাই আসমানি কিতাব আল-কোরান।

আল্লাহ স্রষ্টা হলেই যে মানুষের জন্য গাইড লাইন দিবেন বা এর প্রয়োজন অনুভব করবেন তা নিশ্চিৎ হবেন কিভাবে? মানুষ ঈশ্বরকে নিজের মত কল্পনা করে। মনে করে মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন খুশি হওয়া, রাগ করা, সৃষ্টি হিসাবে মানুষের খোঁজখবর নেয়া ইত্যাদি প্রাণীসুলভ বৈশিষ্ট্যও স্রষ্টার রয়েছে এবং সে ইবাদত করলেই তিনি খুশি হয়ে যাবেন। আল্লাহ-ঈশ্বর-স্রষ্টা যে আমাদের জন্য শুভময় সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হলাম কিভাবে? আমরা যদি আমাদের আনন্দে থাকাটাকে ঈশ্বরের অবদান বলে মনে করি তাহলেও তাকে শুভকর কিছু

বলে মেনে নিতে কেউ সন্দিহান হতে পারে কেননা অশুভ কিছু কি মানুষকে আনন্দ দিতে পারে না? এখানে যুগের পর যুগ মানুষের অফুরন্ত দুর্দশার কথা নাই বা বলা হল যা ঈশ্বরের দ্বারা এক মুহূর্তে সমাধান যোগ্য। ঈশ্বর অধিকাংশ মানুষকে জেনেশুনেই অনন্তকাল ধরে নরকভোগের জন্যই সৃষ্টি করেছেন (কোন মানুষ কে কি করবে তা জেনেও তাকে সৃষ্টি করেছেন আর মানুষকে পাপপ্রবণ করে তৈরি না করলে তো সে পাপ করত না)। অনেকে বলবেন আল্লাহ পাপী না বানালে পরীক্ষা করবেন কিভাবে? আমাদের প্রশ্ন আল্লাহর পরীক্ষা করার দরকারটা কি? কিসের জন্য পরীক্ষা? কোন আত্মতৃপ্তির জন্য? আল্লাহর মত সৃষ্টিকর্তার কিসের অভাব থাকতে পারে? মানুষের কাছ থেকে যদি ইবাদত/স্তুতি পাবার জন্য সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলেও বলা যায় আল্লাহর উদ্দেশ্য সফল না। বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহর ইবাদত দূরে থাক, বিশ্বাস পর্যন্ত করে নি। এছাড়া আল্লাহর ইবাদত পাবার অভিলাষ তাকে নিদারুণ খাটো করে তোলে।

ঈশ্বর যদি কোনো মানুষের জন্য অনন্তকাল নরক বাসের শাস্তি দিতে চান তবে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ঈশ্বর নামক সত্তা অসীম অশুভকর এবং চরম নিন্দনীয়। আর যদি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের ঈশ্বর ও ঈশ্বরের গুণাবলী ঐ ধর্মের প্রচারকের বুজরুকি হয় তবে ওই ধর্মপ্রচারকও তার কল্পিত ঈশ্বরের মতই। ঈশ্বর মানুষকে অনন্তকাল আগুনে পোড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করেন, আবার মানুষের ভালোর জন্য পয়গম্বর প্রেরণ করেন। মানুষের ভালো চাইলে চরম বিপদগ্রস্ত লোককে একটু সাহায্য করলে ক্ষতি কি? যদিও সাহায্য করলে ঈশ্বরের কোনো ক্ষতি নেই এবং তিনি যদি চাইতেন তবে নাকি মানুষ এই ধরনের বিপদেও পড়ত না। মুসলমানরা প্রায়ই হজে গিয়ে একেবারে পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়, হিন্দুরা তীর্থে গেলে, অমরনাথ মন্দিরে গেলে, কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে মারা পড়ে। ঈশ্বরের সন্ধানে গেলেও জানের নিরাপত্তা নেই। ঈশ্বরের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। তাঁর আতিথেয়তার ধরন সভ্য মানুষের মত নয়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে আছে, এক মুঠো খাবার যোগাড়ের জন্য নারী-পুরুষ তার সর্বস্ব বিকিয়ে দিচ্ছে, অথচ তাদের আর্তনাদ ঈশ্বরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। এরপরও ধর্মবেত্তারা বলেন, মনুষ্যজাতির জন্য না-কী ঈশ্বরের দরদ অপরিসীম। মানুষের মঙ্গলের জন্যই পয়গম্বর, অবতার আসেন এ ধরণীতে?

মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা আছেন মানেই ধর্মবাদীরা মনে করেন তিনি কোনো একটি ধর্মের বর্ণিত ঈশ্বর হতেই হবেন। আর ঐ ধর্ম তাদের-ই ধর্ম। এটা যেমন একজন হিন্দুর বিশ্বাস, একজন খ্রিস্টান, ইহুদিও এমন বিশ্বাস করে থাকেন। একজন মুসলিমও এমনটা বিশ্বাস করে থাকেন।

৬। কোরান রচনায় নবী মুহাম্মদের স্বার্থ কি ছিল? তিনি যদি কোরানকে নিজের রচিত বলে প্রচার করতেন তবে যুগশ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতেন।

উপরের দাবিটি বড় আবেগ সর্বস্ব। সাবধানে শব্দচয়ন ছাড়া কোনো উপায় নেই। নচেৎ

আমাদের ধর্মবাদীদের কোপের মুখে পড়তে হতে পারে। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহালমহল জানেন আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবের মক্কার প্যাগান বংশে জন্ম নেয়া আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ পিতার মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছেন। আরবে সে যুগের আট-দশজন শিশু-কিশোরের মতোই তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে। জীবনের দীর্ঘ চল্লিশটি বছর পার করে এসে তিনি 'নবী-রসুল' মুহাম্মদ হয়েছেন। আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ 'নবী মুহাম্মদ' হতে পেরেছিলেন কোরানকে আল্লাহর বাণী বলে প্রচারের মাধ্যমে। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে হজরত মুহাম্মদের কথায় বিশ্বাস করার লোকের অভাব হয়নি, আজকের যুগেও ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে একেক জন পীর, ঠাকুর, বাবাজির লক্ষ লক্ষ শিষ্য, মুরিদ থাকে। অলৌকিক কীর্তিকলাপে বিশ্বাস করার লোকের অভাব হয় না আজও। আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ বিয়ের পূর্বে আরবের ধন্যাঢ্য এক নারী ব্যবসায়ীর বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন। সেখান থেকে তিনি গোটা আরব জাতিকে সংঘবদ্ধ করেছেন, রাষ্ট্রনায়ক হয়েছেন কোরানের বাণী প্রচারের মাধ্যমেই।

কোরানের কয়েকটি আয়াত দেখা যাক : 'হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (সুরা আহযাব, আয়াত ৫০)। স্বীয় পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য যে আয়াত নাজিল হয় : 'অতঃপর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।" (সুরা আহযাব, আয়াত ৩৭)।

সিদ্ধান্তের ভার পাঠকের উপর। অস্বীকার করা যায় না আরবের একজন আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ থেকে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত উত্তরণে দীর্ঘ তেষট্টি বছরের জীবনে প্রচুর ঘাত-প্রতিঘাত, সুবিধা-অসুবিধা, বিপদসংকুল বন্ধুর পথ, পারিবারিক সমস্যা, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, অভিলাষ পূরণের মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে।

৭। নবী মুহাম্মদ উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন। তার মতো একজন মানুষের পক্ষে কোরানের মত অসাধারণ একটা গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। সুতরাং উহা অলৌকিক গ্রন্থ।

ক) কোরানে কয়েকটি আয়াতে এমন কথা বলা হয়েছে নবী মুহাম্মদ উম্মি বা নিরক্ষর :

“Those who follow the Messenger, the Prophet who can neither read nor write…”। কোরানের (মক্কায় অবতীর্ণ) ৭নং সুরা আ’রাফ, আয়াত ১৫৭, (মক্কায় অবতীর্ণ) ২৯নং সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৮, (মদিনায় অবতীর্ণ) ৬২নং সুরা জুম্‌আ, আয়াত ২-এ নবীজিকে উম্মি বা নিরক্ষর হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদের জীবন-ইতিহাসে থেকে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। অনেক পশ্চিমা ইসলামি পণ্ডিত (Maxime Rodinson, Montogomery) মনে করেন ‘উম্মি’ বলতে হজরত মুহাম্মদকে কোরান শরিফে একেবারেই নিরক্ষর বা লিখতে-পড়তে জানেন না বলে বোঝানো হয় নি বরং শুধু বোঝানো হয়েছে নবী মুহাম্মদ পূর্বে ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ (তৌরাত, ইঞ্জিল) পাঠ করেন নি। পশ্চিমা পণ্ডিতরাও তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে সুরা আনকাবুতের ৪৮নং আয়াত হাজির করেন। ঐ আয়াতে বলা হয়েছে : “তুমি তো এর পূর্বে কোনো কেতাব পড়নি বা নিজ হাতে কোনো কেতাব লেখনি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করবে।”

তাছাড়া নবী মুহাম্মদের সকল জীবনীকারক জানিয়েছেন, সেসময় মক্কা ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি এবং নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ছোটবেলা থেকেই মুহাম্মদকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রায়ই মক্কার বাহিরে যেতে হত। সেই বহির্বাণিজ্যে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার ছাপ রেখেছিলেন। একজন বণিকের যদি সামান্য অক্ষর জ্ঞান না থাকে এবং হিসাব-নিকাশ চালানোর মতো গণনা দক্ষতা না থাকে তাহলে বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। বিবি খাদিজা প্রথমে হজরত মুহাম্মদকে বাণিজ্যে দক্ষতার কারণেই মুগ্ধ হয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচালকরূপে নিয়োগ দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে পরিণয়ের দিকে সম্পর্ক গড়ায়। খাদিজার মতো একজন ব্যবসায় সফল-অভিজ্ঞ রমণী তাঁর ব্যবসার বৈদেশিক দায়িত্ব একজন নিরক্ষর ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিবেন কেন? হাদিসে প্রচুর পরিমাণ বক্তব্য রয়েছে, যা হজরত মুহাম্মদকে লেখাপড়া জানা-বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবেই তুলে ধরে। হাদিসের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে গুটি কয়েক এখানে উল্লেখ করা যাক : (১) উসরা হতে বর্ণিত, ছয় বছরের আয়েশার সাথে বিয়ের কাবিন রসুল মুহাম্মদ নিজেই লিখেছেন। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৮৮)। (২) ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, একটি লোকের হাতে লাল চামড়ায় আল্লাহর রসুলের পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য লেখা ছিল বানু জুহাইর ইবন উকাইশের জন্য। বক্তব্য হচ্ছে : “তোমরা যদি অন্য কোনো ঈশ্বর বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নাও, মুহাম্মদকে (দঃ) আল্লাহর রসুল বলে স্বীকার করো, যাকাত দাও, নামাজ পড়ো তবে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে।” এরপর লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হল, এই বার্তা কে লিখে দিয়েছে? লোকটি উত্তর দিল ‘আল্লাহর রসুল’। (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১৯, নম্বর ২৯৯৩)। (৩) আল বারা হতে বর্ণিত, নবী ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, যতক্ষণ না তিনি রাজি হন মক্কাবাসীর সাথে চুক্তি করতে। তিন দিন অপেক্ষার পর তিনি শান্তি চুক্তি করতে রাজি হলেন। চুক্তিতে লেখা হলো ‘আল্লাহর

নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে...।' মক্কার লোকেরা প্রতিবাদ করে উঠলেন। তারা নবী মুহাম্মদকে 'আল্লাহর নবী' বলে স্বীকার করতে চাইলেন না। বললেন, মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহর পুত্র, এটাই লেখা হোক। এ নিয়ে দ্বন্দ্বে যখন চুক্তি প্রায় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম তখন হজরত মুহাম্মদ হজরত আলীকে নির্দেশ দিলেন, চুক্তিপত্র হতে 'আল্লাহর নবী' শব্দ কেটে দিতে। কিন্তু আলী রাজি হলেন না। তখন নবী মুহাম্মদ নিজেই চুক্তিপত্র হাতে নিয়ে নিজ হাতে কেটে দিলেন এবং 'আল্লাহর নবী' শব্দটির জায়গায় যোগ করলেন 'আব্দুল্লাহর পুত্র'। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৫৫৩)। যে ব্যক্তি 'নিরক্ষর', লিখতে-পড়তে জানেন না বলা হচ্ছে, তিনি কিভাবে কোনো একটা লিখিত চুক্তি থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে তা কেটে দিতে পারেন? এছাড়া ইসলামি ধারণা মতে কোরান শরিফের প্রথম 'নাজিলকৃত' সুরা, ৯৬নং সুরা আলাকের ১-৪নং আয়াতে 'পাঠ করার কথা বলা হচ্ছে', প্রশ্ন দেখা দেয়, যে ব্যক্তি নিজেই লেখাপড়া জানেন না বলে দাবি করা হচ্ছে, তিনি কিভাবে আল্লাহর ওহি নিয়ে এসে জনসাধারণকে 'পাঠ' করার কথা বলেন? সুরা আলাক-এ কোরান পড়া ও কলমের কথাও বলা হয়েছে- "আপনি কোরান পড়ুন, আর আপনার রব অত্যন্ত দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।" আবার ৬৮নং সুরা কলমের প্রথম আয়াতেই 'কলম' এবং 'লেখনী'র শপথ নেয়া হয়েছে, যা অবশ্যই লক্ষণীয়।

খ) উপরের তথ্য থেকে জানা যায়, হজরত মুহাম্মদ একদম নিরক্ষর বা স্বাক্ষর জ্ঞানহীন ছিলেন এমনটা নয়। বরং বিপরীত চিত্রই ফুটে ওঠে। যাহোক এর বাইরে আরো কিছু যুক্তি রয়েছে কোরান রচনার জন্য অক্ষর জ্ঞান থাকতে হবে কেন? কোরান লেখার জন্য সবসময় কাতিবে ওহি বা ওহি লেখকরা প্রস্তুত ছিলেন। 'ওহি' লিখে রাখা ও মুখস্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৪২-৪৩ জন সাহাবির সাহায্য নিয়েছেন। ওহি লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিবি খাদিজা, খাদিজার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফল, চার খলিফা, আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ-পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিস (৬২৯ সালে মুতা যুদ্ধে তিনি মারা যান)। এরপর নানা সময়ে বিবি আয়েশা, বিবি উম্মে সালমা, মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক, হজরত মুহাম্মদের ব্যক্তিগত সহকারী জায়েদ বিন সাবিত (জায়েদ আরবি ছাড়াও পার্সিয়ান, গ্রিক, ইথিওপিক, কপটিক, সিরিয়ান, হিব্রু ভাষা জানতেন, পাশপাশি ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল), খলিফা উসমানের সৎভাই আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ, বিখ্যাত কবি হাসান বিন সাবিত, প্রাক ইসলামি যুগের শেষ প্রজন্মের জনপ্রিয় কবি লাবিদ ইবনে রাবিয়া বিন জাফর আল-আমিরি ('দিওয়ান' নামের প্রাচীন আরবীয় কবিতা সংকলনের লেখক), আবু সুফিয়ান পুত্র মুয়াবিয়া, খালিদ বিন ওয়ালিদ, ব্যক্তিগত ভৃত্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ, ওবেই ইবনে ক্বাব (আবু মুন্ধির নামেও পরিচিত; মদিনার প্রথম ব্যক্তি যিনি আকাবার দ্বিতীয় শপথ গ্রহণকালে ইসলাম গ্রহণ করেন), আমর ইবনুল আস, মুহাম্মদ বিন-মাছলামা (কবি কাব বিন আল-আশরাফ-এর হত্যাকারী), আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের,

আব্দুর রহমান বিন আল-হারিস বিন হিশাম প্রমুখ। (দ্রষ্টব্য : মুনীর উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ*, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, পৃষ্ঠা ৯-১০)। ওহি লেখকদের কেউ কেউ বিখ্যাত কবি ছিলেন, যেমন লাবীব, হাসান বিন সাবিত। তারা হজরত মুহাম্মদের মুখনিঃসৃত বাণী লিখে রাখতেন। কাব্যে রূপ দেয়ার কৌশলটা তাহলে কার? হয়তো ওহি লেখকদের বলতেন তিনি ওই ধারণা বা মত বা আদেশ আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন এবং তারাই একে কাব্যে রূপদান করে লিপিবদ্ধ করত। পরবর্তীতে মানুষ মনে করতে লাগল কোরানকে যেভাবে তারা দেখতে পাচ্ছে অবিকল সেভাবেই আল্লাহতায়ালা নবী মুহাম্মদের কাছে তা নাজিল করেছেন।

গ) আমাদের দেশের বাউল-লোকশিল্পীদের কথা ধরা যাক। এদের বেশিরভাগ নিরক্ষর বা একেবারেই শিক্ষা-দীক্ষা নেই। কিন্তু ফকির লালন শাহ, আব্দুল করিম প্রমুখ এমন অনেক সংগীত, গীতিকবিতাসহ অনেক মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন যেগুলো অনেকের কাছে ধর্মগ্রন্থের বাণীর চেয়েও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং নান্দনিক।

ঘ) কোরানের সংকলন তেমন গোছালো নয়। কোরানের প্রথম সুরা 'ফাতিহা' কিন্তু প্রথম ওহি বা প্রত্যাদেশ নয়। 'আল্লাহর কাছ থেকে জিব্রাইল মারফত আসা' প্রথম দিনের 'প্রত্যাদেশ' স্থান পেয়েছে ৯৬ নম্বর সুরা আলাকের ১-৫নং আয়াতে (বাকি ৬-১৯নং আয়াতগুলো অনেক পরে এসেছে)। দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ স্থান পেয়েছে ৭৪ নম্বর সুরা মুদ্দাসসির'র ১-৫নং আয়াতে আর জীবনের অন্তিম 'প্রত্যাদেশ'টি স্থান পেয়েছে ২ নম্বর সুরা 'বাকারা'র ২৮১নং আয়াতে। সময়ের ক্রম হিসাবে আসা সুরাগুলো এবং অন্তর্গত আয়াতগুলি কেন এতো অবিন্যস্ত? ৬১৫/৬১৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত সুরা নজমের বর্তমান অবস্থান ৫৩ নম্বরে; এবং আরো প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে ৬২০/৬২১ খ্রিস্টাব্দে বর্ণীত সুরা 'ইসরা' বা 'বনি-ইজরাইল'-এর বর্তমান অবস্থান ১৭ নম্বরে কেন? খলিফা উসমানের 'সংকলিত কোরান' নিয়ে হজরত আলীর প্রচণ্ড মতদ্বৈততা ছিল। তাঁর মতামত ছিল 'কোরানের আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কোরান সংকলন করা।' তিনি সর্বপ্রথম (৯৬ নং) সুরা 'আলাক', এরপর (৭৪ নং) সুরা 'মুদ্দাসসির', এরপর (৭৩ নং) সুরা 'মুজ্জাম্মিল', এরপর (১১১ নং) সুরা লাহাব, এরপর (১০৬) নং সুরা 'কোরায়েশ', এইরূপে সময়-কাল-প্রেক্ষিতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মক্কি সুরাগুলো প্রথম দিকে এবং মাদানি সুরাগুলোকে কোরানের শেষের দিকে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোরান সেভাবে সাজানো হয়নি। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে সাজানো হয়েছে; যার বিরোধিতা করেছিলেন হজরত আলী। (দ্রষ্টব্য : বেনজীন খান, *দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৯৩)।

৮। হজরত মুহাম্মদ এতই সৎ ছিলেন যে আরবের কাফেরেরা পর্যন্ত থাকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলত। তিনি ছিলেন অতিশয় ন্যায়পরায়ন, সদাশয়, সচ্চরিত্রবান ও দয়ালু। তার মত একজন মানুষ কোরান নিজে রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়ার মত প্রতারণা করতে পারেন না।

এই ধরনের দাবিও চূড়ান্তরূপে আবেগসর্বস্ব। যৌক্তিক নয়। এ ধরনের দাবির উত্তর প্রদান আমাদের জন্য কিছুটা বিব্রতকরও বটে। তবু যতটা সম্ভব গা বাঁচিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক। এটা সকলেই জানেন বিভিন্ন ধর্মের নবী, রসুল, পয়গম্বর, অবতার, মহাপুরুষের জীবন-ইতিহাস লিখেছেন তাদের অনুগত ভক্তবৃন্দরাই। অনুগত ভক্তবৃন্দের হাতে রচিত সেই জীবন-ইতিহাসকে কতটা নিরপেক্ষ বলা যায়? কোনো পয়গম্বর, নবী, মহাপুরুষের জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে তুলনামূলক রেফারেন্স খুব কমই পাওয়া যায়। অনুগত ভক্তবৃন্দরা মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে রচিত মতামত ধ্বংসে যতটা পারঙ্গম, সংরক্ষণে মোটেও উৎসাহী নন। আমাদের এই সময়েই যেখানে কোনো সততা-অসততা নির্ধারণ জটিল হয়ে যায়, সেখানে দেড় হাজার বছর আগে কোনো ব্যক্তির সততা পরিমাপ নিরপেক্ষ, নির্মোহভাবে করা জটিল নয় কী? এটা তো সবাই মানবেন বর্তমানকালের যেসব রাষ্ট্রনায়ক ব্যক্তিগত জীবনে যতই উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণ পালন করুন না কেন, দলীয় সমর্থকদের কাছে তিনি সাধু। প্রশংসায় আর স্তুতিতে অনুগতদের জিহ্বা বিশ্রামহীন।

আব্দুল্লাহ পুত্র হজরত মুহাম্মদ বিবি খাদিজার অধীনে বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন, পরবর্তীতে জীবনসঙ্গী হিসেবে পথচলা, মক্কা বিজয়ের পর প্রভূত অর্থবিত্তের মালিক আর ক্ষমতাবান হয়েছিলেন। যারা নবী মুহাম্মদের জীবন-ইতিহাস লিখেছেন সংরক্ষণ করেছেন তারা সবাই মুসলমান ছিলেন, হজরত মুহাম্মদকে আল্লাহ প্রেরিত রসুল বলে বিশ্বাস করতেন। তাদের রচিত গ্রন্থগুলো থেকে পরবর্তীতে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে জেনেছেন।

একজন মানুষ যিনি কাউকে নবী-রসুল বলে বিশ্বাস করেন তিনি কি পারবেন নির্মোহ-নিরপেক্ষভাবে জীবন-ইতিহাস লিখতে? স্বাভাবিকভাবেই তিনি যা লিখবেন তা হবে প্রশস্তিময় বাক্য। তাছাড়া একজন ব্যক্তির সততা দিয়ে অলৌকিকতার প্রমাণ দেয়া কি সম্ভব?

সততা মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ। সততার জন্য কাউকে 'বিশ্বাসী' উপাধি দিতে হবে কেন? এরকম নজির আর কী কোথাও আছে? সততার জন্য যদি বিশ্বাসী উপাধি দিতে হয় তবে বর্তমানে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা এগুলোর কর্মকর্তাদের দিতে হবে। আমরা এসব প্রতিষ্ঠানে বৈধ-অবৈধ উপায়ে অর্জন করা প্রচুর টাকা-পয়সা আমানত রাখি আর তারাও এগুলো খিয়ানত করেন না।

আরবি ভাষায় আমিন মানে শুধু 'বিশ্বাসী' নয়, বরং বোঝায় কোনো বিষয়ে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ব্যবসায়ী ধরনের কিছু। (যারা অর্থলগ্নি বা অর্পিত দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে সমাপন করতো। অনেকটা 'ট্রাস্টি' ধরনের কিছু। স্কুল ট্রস্টি, নগর ট্রাস্টি এই ধরনের শব্দের সাথে আমরা পরিচিত। আরবিতে এটা অনেকটা সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কর্মচারী, প্রধান ইত্যাদি অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়। যেমন : আমিন-আল-মক্তবা অর্থ মক্তবের ট্রাস্টি। আমিন-আল-সর্তা অর্থ পুলিশের ট্রাস্টি, কর্মকর্তা ইত্যাদি)। আমরা জানি হজরত মুহাম্মদ

খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্বে ছিলেন। ইতিহাসবিদ Alford Welch-এর মতে 'আল-আমিন' ঐ সময় আরবের বহুল প্রচলিত একটি নাম ছিল; এবং হজরত মুহাম্মদের ডাক নাম আমিন, তাঁর মায়ের নাম 'আমিনা'-এর পুরুষবাচকরূপ।

হজরত মুহাম্মদের সততা আর কোরান আল্লাহর বাণী দুটি ভিন্ন ব্যাপার। কেউ সৎ ছিলেন তার মানে তিনি জীবনের সব কাজেই সৎ ছিলেন তাও নয়। হজরত মুহাম্মদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ২৩টি বছর ধরে 'ইসলাম প্রচার'। এখন ইসলাম প্রচারের বিষয়টি বাদ দিয়ে ব্যক্তি হজরত মুহাম্মদকে সৎ প্রমাণ করে কি লাভ?

হজরত মুহাম্মদকে মহিমান্বিত করার জন্য ইসলাম-পূর্ব যুগকে 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' বলে প্রচার করা হলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎস থেকে জানা যায় ইসলামপূর্ব আরবে নিয়মিত কবিতা প্রতিযোগিতা হত, সাথে তর্ক-বির্তক, তাৎক্ষণিকভাবে রচিত কবিতা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হত। ইসলাম-পূর্ব যুগে কবিতা প্রতিযোগিতা হত। আরবের দক্ষিণের নাজরান শহর, মক্কার নিকটে মাজনাতে, আরাফাত পাহাড়ের নীচে ধুউল মাজাজে কবিতা মেলা হত। সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা হত মক্কার পূর্বে নাখালা উপত্যকার পাশে বাণিজ্য নগরী 'ওকাজ'-এ। ওকাজের মেলা সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, 'ওকাজ আজকে যা বলে, সারা আরবে আগামীকাল তার পুনরাবৃত্তি হয়।' ওকাজের মেলা ছিল আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোত্র ও বহু ধর্মের মানুষের সমন্বয়শীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিলন মেলা। মুক্ত আলোচনা, যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক, জনপ্রিয় কবিদের 'কাসিদা' (গীতিকবিতা) প্রতিযোগিতা ছিলো মেলা বা সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। সাহিত্য সম্মেলনে কবিতা পাঠ করা কবিদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের ও জীবনের আরাধ্য একটি বিষয় ছিল। ঐ সময় বিজয়ী কবিতাকে পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে পর্দার কাপড়ে লিখে কাবা ঘরসহ দেব-দেবীর মন্দিরের দেওয়ালে টানিয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। তখন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েসসহ আমর ইবনে কুলসুম, তারাফা, অন্তরা, নাবিঘা, জুহাইর, আশা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিদের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত মোয়াল্লাকাত বা ঝুলন্ত কবিতায় কাবা ঘরের দেওয়াল অলংকৃত হতো। হজরত মুহাম্মদের অন্যতম 'ওহি' লেখক আরবের বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন রাবিয়া ইবনে জাফর আল-আমিরির কবিতাও এই তালিকায় সংযোজিত ছিল। অথচ মক্কা বিজয়ের পর আরবের 'অলিম্পিক' হিসেবে পরিচিত ওকাজের মেলাসহ অন্যান্য কবিতা উৎসব হজরত মুহাম্মদ বন্ধ করে দেন।

বলা যায়, ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের নারীরা অনেক স্বাধীন ছিল। বিবি খাদিজা ইসলাম-পূর্ব আরবের বিধবা রমণী এবং সেই সময়কার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ইসলামি গ্রন্থে রয়েছে, সেসময় নারীরা পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ যেত। অভিযোগ মেয়ে সন্তান জন্ম নিলেই হত্যা করা হত ইসলাম-পূর্ব আরবে অথচ মেয়েদের হত্যা করা হলে বংশধারা রক্ষা করা হত কিভাবে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠে না।

পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে হজরত মুহাম্মদ হজরত আবু বকরের ছয় বছর বয়সী শিশু কন্যা আয়শাকে বিয়ে করেছিলেন। এই ধরনের বিয়ে আধুনিক কালে সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। যুদ্ধবন্দি পুরুষ ও নারী-শিশুদের দাস বানানোকেও বৈধতা দেয়া হয়েছে ইসলামে। যুদ্ধবন্দির সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের জেনেভা কনভেনশনে খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। ইসলামে দাস প্রথাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দাস প্রথাও আধুনিককালে গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। কোরান দুর্বোধ্য। আল্লাহর বাণী দুর্বোধ্য হবেই। এছাড়া কোরান অনুবাদ পড়ে বুঝা সম্ভব হয় না। আর এর ফলে মানুষ তা আল্লাহর কিতাব বলে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়।

আল্লাহ যদি মানুষের সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলেন তবে নিশ্চয়ই তা মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার দায়িত্ব তাঁরই। কেননা মানুষ কি বুঝবে, আর কি বুঝবে না, কোন বিষয়টা কতটুকু বুঝবে তা আল্লাহতায়ালা জানার কথা। (কারণ তিনি সর্বজ্ঞ)। সুতরাং তিনি যদি মানুষকে এমন ভাষায় উপদেশ বা আদেশ দেন যা মানুষ বুঝতেই পারল না বা ভুল বুঝল তবে সে দোষ নিশ্চয়ই মানুষের নয়।

কোরানের অনেক আয়াতে কোরানকে সহজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে কোরান সম্পর্কে উপরের দাবিটি খাঁটে না। কোরান দুর্বোধ্য এ দাবিটা তখনই শোনা যায় যখন কেউ কোরানের অলৌকিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। কোরান দুর্বোধ্য কিন্তু তা কি সবার কাছেই দুর্বোধ্য? যিনি তা বুঝতে পারেন তিনি ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেও সবাই কি তা বুঝবে না? কোরানের দুর্বোধ্যতার জন্য কেউ যদি কোরান পড়ে এটা অনুধাবন করতে অক্ষম হয় তবে তার দায় তো আল্লাহর, তাই না?

আরেকটি দাবি শোনা যায় কোরানের অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে এর মর্মার্থ বোঝা সম্ভব নয়। অবশ্য এই দাবিরও তেমন শক্ত ভিত্তি নেই। পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরা বিনিময় করেছে, মর্মার্থ অর্জন করেছে অনুবাদের সাহায্যে। সেক্ষেত্রে তেমন সমস্যার কথা শোনা যায় না। এমন কী, কোরান বোঝার জন্য যদি আরবি শিখতে হয়, তবে বেদ বোঝার জন্য সংস্কৃত শিখতে হবে, ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্ট বুঝার জন্য হিব্রু শিখতে হবে, খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্ট বুঝার জন্য গ্রিক শিখতে হবে, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক বোঝতে হলে পালি ভাষা শিখতে হবে এমন দাবি তো অন্য ধর্মাবলম্বীরাও করতে পারেন। এভাবে কতদূর?

'কোরানের অনুবাদ পড়ে কোরান ঠিকমত বোঝা যায় না'—বলে যারা দাবি করেন, তারা কি অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোকে ঐ গ্রন্থের মূল ভাষায় পাঠ করেছেন? মূল ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থগুলোকে যাচাই করে তারপর ইসলাম ধর্ম সঠিক মেনে নিয়ে গ্রহণ করেছেন কি? অবশ্য কোনো কিছু যাচাই-বাছাই না করে শুধু পারিবারিক সূত্রে পাওয়া ধর্মীয় বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকলে ভিন্ন কথা।

আরবি ভাষাভাষী বা আরবি ভাষা জানেন এমন অনেক অমুসলিম পূর্বেও ছিলেন এখনও

আছেন। হজরত মুহাম্মদের আপন আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশীরা নিশ্চয় আরবি জানতেন। তবে তাদের কাছে কোরানকে আল্লাহর বাণী মনে হয় নি কেন? অর্থাৎ আরবি জানা থাকলেই, কিংবা কোরান বুঝলেই মনে হবে তা আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ এরকম নয়।

এবার কয়েকটি আয়াত দেখা যাক : 'নিশ্চয় আমি এ কোরানকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (সুরা দুখান, আয়াত ৫৮)। 'নিশ্চয় আমি কোরানকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পার।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত ২)। 'আমি কোরানকে আপনার ভাষায় এই জন্য সহজবোধ্য করিয়াছি যেন আপনি উহার সাহায্যে খোদাভীরুগণকে সুসংবাদ দিতে পারেন।' (সুরা মারইয়াম, আয়াত ৯৭)। 'আর আমি সহজ করিয়া দিয়াছি কোরানকে উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব, কেহ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি। (সুরা ক্বামার, আয়াত ১৭)।

এরপরও কোরানকে দুর্বোধ্য, অনুবাদ পড়ে বুঝা সম্ভব নয় ইত্যাদি দাবি তুলে অলৌকিক বলে চালিয়ে দেয়া কি যায়?

১০। কোরানের সাংখ্যিক মাহাত্ম্য রয়েছে। সুতরাং কোরান অলৌকিক গ্রন্থ।

এই দাবির বিস্তারিত জবাব এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। তাই এখানে আর নতুন করে কিছু বলা হচ্ছে না।

পরিশেষে আরো কিছু কথা :

১। কোরানে একই বিষয় বার বার বলা হয়েছে। নামাজ পড়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে ৮০ বারেরও বেশি অথচ তা একবার বলাই কি যথেষ্ট ছিল না? অহেতুক বাহুল্য বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়।

২। আল্লাহ যদি সত্যিই কোরান অবতীর্ণ করে থাকেন, তিনি যদি মহান, দয়ালু সর্ব-শক্তিমান হয়ে থাকেন, মানুষের স্রষ্টা হয়ে থাকেন তবে কোরানে এত ভীতি প্রদর্শনের কি দরকার ছিল? সুরা লাহাব পাঠ করলে দেখা যায় আল্লাহের, তাঁর সৃষ্টি সামান্য মানুষের প্রতি ক্রুদ্ধতা কত তীব্র!

৩। আমাদের সংশয়বাদী মন বলে কোরানের অনেকগুলো আয়াতের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে নেই। যেমন হজরত মুহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবনসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা বর্তমান যুগে প্রয়োজনজীন। কিছু আয়াত হজরত মুহাম্মদের জীবদ্দশায়ই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই আয়াতগুলো কোরানের অলৌকিকতার দাবিকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দেয়।

৪। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ, দাসপ্রথা নিষিদ্ধ, যুদ্ধবন্দির সাথে ব্যবহার, মর্যাদা সম্পর্কে আধুনিককালের অনেক আইন কোরানে বর্ণিত নির্দেশনামার চেয়ে অনেকের কাছে অধিক মানবিক বলে মনে হয়। এগুলো কি কোরানের শ্রেষ্ঠতাকে ক্ষুণ্ন করে তোলে না?

৫। হজরত মুহাম্মদ নিজে কাউকে কোরান সংকলনের দায়িত্ব দিয়ে যান নি। তাঁর মৃত্যুর

পর উত্তরসূরিরা এ নিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যান। কোরান সংকলন ও কোরানের অন্যান্য কপি পোড়ানোর কারণে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে ইসলামের ইতিহাসে। কোরান সংকলনের সময় ন্যূনতম দুই জন সাক্ষী পাওয়া গেলে কোনো বক্তব্যকে 'কোরানের বাণী'রূপে গ্রহণ করা হত। তাহলে এই পদ্ধতিতে কোরানকে একদম 'অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয়' রূপে সংকলন করা সম্ভব হয়েছে, এমন দাবির প্রতি সংশয় করাই যায়।

কোরানের বাণী সময়কালের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংকলন করা হয়নি। বিভিন্ন সুরা, আয়াতের সঠিক বিন্যাস কি হবে তা নিয়ে অমীমাংসিত প্রশ্ন সংকলনের সময়কাল থেকেই চলে আসছে।

৬। কোরানের অলৌকিকতার দাবির সাথে হজরত মুহাম্মদের নবুয়তির দাবির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেউ নবুয়তি দাবি করলে তা প্রমাণ করা তার নিজেরই দায়িত্ব। কোরানের বিভিন্ন আয়াতের শানে নুজুল পাঠে দেখা যায় মুহাম্মদ যখন নবুয়তির দাবি করেছিলেন তখন হিজরতের আগ পর্যন্ত প্রায় এক যুগে অতি সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া কেউই তা বিশ্বাস করেনি এবং লোকে মুহাম্মদকে পাগল, কবি, জাদুকর ইত্যাদি বলে উপহাস করেছে। আল্লাহতায়ালা জিবরাইলের কাছে কোরানের বাণী দিয়েছেন, জিবরাইল আবার সে বাণী হজরত মুহাম্মদ কাছে পৌঁছে দিয়েছেন-এগুলোর কোনো প্রমাণ সম্ভব নয়। জিবরাইল যে সত্যি সত্যিই জিবরাইল, তা অন্য কিছু না বা বিভ্রম নয়, তা কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে? আমাদেরকে কখনো ভুলে গেলে চলবে না হজরত মুহাম্মদ রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন। দেড় হাজার বছর আগের কারো নবুয়তি প্রমাণের কোনো রাস্তা আর খোলা নেই। আর যে কোনো অপ্রমাণিত বিষয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্বাধীনতা সবারই রয়েছে।

আমরা এ কথা স্পষ্টভাবে মনে করি—ধারণ করি, ধর্মগ্রন্থগুলো পড়তে হবে যার যার নিজের ভাষায়, যুক্তি প্রয়োগ করে বুঝতে হবে ধর্মগ্রন্থের বাণীর মর্মার্থ। শুধু পুণ্যলাভের আশায় না বুঝে পবিত্র ভাষায় পাঠ করা থেকে বিরত থাকা ভালো। না বুঝে পাঠ করলে শুধু অজ্ঞতাই বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান বৃদ্ধি পায় না। আর এই অজ্ঞতা নামক দুর্বলতার সুযোগ নেয় আমাদের চারপাশের কিছু মোল্লা-মৌলভি, পীর-ফকির, ঠাকুর প্রমুখেরা। তাই সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল করে তুলতে হলে, যুক্তিবোধের বিকাশ ঘটনানোর কোনো বিকল্প নেই। ঝেড়ে ফেলি সকল অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর পবিত্র বিশ্বাসের নামে অপবিশ্বাসগুলো। এর কোনো বিকল্প নেই।

যারা ধর্মবিশ্বাসী তারা সবাই নিজ নিজ ধর্মসহ অন্য ধর্মকেও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করা উচিৎ। মুক্তভাবে চিন্তা করে দেখা উচিৎ কোনটা কতটা গ্রহণীয়। বর্তমান বিশ্ব যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দর্শনে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে সেখানে আমরা যদি কতগুলো অপবিশ্বাস নিয়ে বসে থাকি তবে তা আমাদের জন্য খুব একটা মঙ্গল বয়ে আনবে না। অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে মুক্তচিন্তার দিকে অগ্রসর হওয়া হল আমাদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা সমস্যা সমাধানের

প্রথম ধাপ। আমরা যদি অযৌক্তিক বিশ্বাসকে রেখে কোনো বিষয় চিন্তা করি তবে তা ঐ বিশ্বাস দ্বারাই পরিচালিত হবে, তাতে সমস্যা শুধু বাড়বেই। তাই আমাদেরকে প্রথমেই মুক্তচিন্তক হতে হবে, বুঝতে হবে যুক্তি। আমরা যুক্তির পথে, মুক্তচিন্তার পথে অগ্রসর হলে, আমাদের জীবন আনন্দময় ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।